উচ্চশিক্ষা : বর্তমান প্রেক্ষিত, লক্ষ্য ২০৩০

অরবিন্দ দাশ

বর্তমান দশকে সারা ভারতে উচ্চশিক্ষা এক বিচিত্র কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। একদিকে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালামের 'India 2020 : A Vision for the New Millennium'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ভাবনা। অপরদিকে, GER (Gross Enrolment Ratio)-র হার বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রমাণ করা যে আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অগ্রণী। আর তা করতে গিয়ে গুণমান (Quality)-এর গুরুত্ব কমে যাচ্ছে এবং সংখ্যামান (Quantity) বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। সরকারি স্তরে কত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার আঙিনায় আনা যায় সে প্রচেষ্টা সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু গুণমানকে গুরুত্ব না দিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্থবহ হয় না।

দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাক। সবথেকে উল্লেখযোগ্য—উচ্চশিক্ষা পরিমণ্ডলের বৃহত্তর অংশ এখন বেসরকারি। দেশের ৬৪ শতাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ৫৯ শতাংশ উচ্চশিক্ষার্থী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের—যা এক দশক আগেও ছিল যথাক্রমে ৪৩ ও ৩৩ শতাংশ। সঙ্গত কারণে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাযথভাবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৭-১০১২) ভারতে GER ছিল ১২.৩ শতাংশ, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.৯ শতাংশ।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নথিভুক্ত শিক্ষার্থী গত ১৫ বছরে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। যেমন, শিক্ষাকর্মী সংখ্যা প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০০-২০০১-এ ছিল ৮.৪ মিলিয়ন, ২০১৩-১৪-তে হয়েছে ৩০.৫ মিলিয়ন। আর দূরশিক্ষায় ওই সংখ্যাদুটি যথাক্রমে ১.৩৮ মিলিয়ন ও ৫.১৭ মিলিয়ন।

এহ বাহ্য, ভারতের GER-এর মান কিন্তু পৃথিবীর গড় মানের (২৭%) অনেকটাই নিচে। আমাদের অবস্থান কেবল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ব্রিটেন প্রভৃতি উন্নত দেশের চাইতে কম নয়—চিন, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশের চাইতেও কম।

বর্তমান অবস্থা

এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় 'ন্যাক' (National Assessment and Accreditation Council)-এর দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে, তাতে দেখা যায় প্রায় ৬২ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও ৯০ শতাংশ মহাবিদ্যালয় মধ্যম মানের বা তারও নিচে অবস্থান করছে। সুতরাং চিত্র খুব আশাব্যঞ্জক নয়। এমতাবস্থায়, বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোয় একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

(১) ***পাঠক্রম ও পাঠদান*** : ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে সেকেলে পাঠক্রম চালু রয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতিও যুগের চাহিদা মেটাতে পারছে না।

(২) ***শিক্ষক-ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের অপ্রতুলতা*** : অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, তা সে যত বড় মাপেরই হোক না কেন, শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ একটা সমস্যা। সারা দেশে রাজ্য সরকারি ও কেন্দ্রীয় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া সর্বত্রই উপযুক্ত মানের ট্রেনিং সমৃদ্ধ শিক্ষকের অভাব দেখা যায়।

(৩) ***গবেষণা*** : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার চর্চা শিক্ষকদের সমৃদ্ধ করে। অথচ এখনও এদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিকমতো গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। পরিকাঠামো ও শিক্ষকদের সদিচ্ছার অভাব যার মূল কারণ। উন্নত দেশে গবেষণাগার ও শিল্প প্রতিষ্ঠান হাত ধরাধরি করে চলে। আমাদের দেশে খুবই সীমিত সংখ্যক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। এছাড়া আমাদের দেশে গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ডিগ্রিসর্বস্ব'। অধীতজ্ঞান প্রয়োগের দিক নিয়ে গবেষকরা খুব বেশি চিন্তিত বলে মনে হয় না। দেখা গেছে। সারা পৃথিবীর প্রকাশিত 'পেপার'-এর প্রতিবেদন প্রভাব (Citation Impact)-এর যা মান, ভারতে তার মান অর্ধেকের কাছাকাছি।

(৪) ***সংযোগস্থাপন*** : ভারতের সীমিত সংখ্যক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদেশের উচ্চমান সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে। অথচ আজকের বিশ্বায়নের যুগে একযোগে কাজের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলার দ্বারা উভয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উপকৃত হতে পারে।

(৫) ***পরিকাঠামো*** : অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো ও তদারকি ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে সন্তোষজনক নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবের কথা বলেই দায়মুক্ত হন।

(৬) ***পরিচালন ব্যবস্থা*** : ইদানীংকালে সারা দেশে অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলী বা স্থায়ী প্রশাসক নেই। আবার থাকলেও রাজনীতির প্রভাবে সঠিকভাবে কাজ করা বিশাল চ্যালেঞ্জের। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এই অবস্থা প্রতিবন্ধকতার কাজ করে।

(৭) ***অনাগ্রহ*** : আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে GER-এর মান বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। যেমন, GER দিল্লিতে ৪৭.৯ শতাংশ, অসমে ৯ শতাংশ, শহরাঞ্চলে ৩০ শতাংশ, গ্রামাঞ্চলে ১১.১ শতাংশ, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষেত্রে ১৪.৮ শতাংশ,

তপশিলি জাতি ১১.৬ শতাংশ, তপশিলি উপজাতির ক্ষেত্রে ৭.৭ শতাংশ, মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৯.৬ শতাংশ, পুরুষ ১৯ ও মহিলা ১৫.২ শতাংশ। শিক্ষাক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে আছে, তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার পর বিশাল একটা অংশ আর শিক্ষাকে চালিয়ে নিয়ে যায় না। স্বভাবতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'কলেজছুট' বা 'ড্রপ আউট'-এর হার বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে, GER (Gross Attendance Ratio) শহর ও গ্রামাঞ্চলে, লিঙ্গ ও সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন।

লক্ষ্য ২০৩০

সন্দেহ নেই আগামী দিনে উচ্চশিক্ষার গতিপথ মসৃণ নয়, বরং যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। শিক্ষাগতভাবে ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে ভারত গতানুগতিক চিন্তাভাবনা থেকে খানিকটা হলেও সরে এসেছে। অপরদিকে, পরিকল্পনাকারেরা কিছু কিছু ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষা করতে অগ্রসর হচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে সমদর্শিতা (equity) ও উৎকর্ষ নিয়ে চলার সুযোগ রয়েছে। ২০৩০ সালে ভারত জনসংখ্যার দিক দিয়ে চিনকে ছাপিয়ে বিশ্বের এক নম্বরে উঠে আসবে। সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীও।

নগরায়ণ ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার চাহিদাও বাড়বে। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ২০৩০ সালে প্রয়োজন হবে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মোট কর্মশক্তি বৃদ্ধি (Gross Incremental Workforce)। দক্ষ মানবশক্তি সরবরাহকারী দেশ হিসেবে ভারতের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ২০৩০ সালে সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে ভারতের প্রয়োজন বিশাল উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা যা বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে এবং প্রস্তাবিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। এখানে কয়েকটি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩১ মিলিয়ন, প্রত্যাশা ২০৩০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭১ মিলিয়ন। এর ফলে GER বেড়ে হবে প্রায় ৫০ শতাংশ। বর্তমানে পৃথিবীর ১৮৬টি দেশের মধ্যে ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকের মান ১৩৮। প্রত্যাশা ২০৩০-এ যুবসমাজের মধ্যে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, আইন-শৃঙ্খলা, গড় আয়ু ইত্যাদির নিরিখে মানব উন্নয়নে সূচকের মান যাতে উন্নত হয় সে-বিষয়ে সজাগ করার।

বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের দেশে সাধারণ পাঠক্রমের স্নাতকদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ আর ইঞ্জিনিয়ারিং ও MBA পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ চাকুরির যোগ্য। প্রত্যাশা, এই সংখ্যা যাতে বেড়ে ৯০শতাংশতে পৌঁছায়। সন্দেহ নেই কেবলমাত্র গুণমান সমৃদ্ধ শিক্ষার দ্বারাই তা সম্ভব।

আমাদের দেশে প্রায় ৭০০টি উচ্চতম ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ্বের প্রথম সারির ৪০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের আছে মাত্র চারটি। প্রত্যাশা বিশ্বের প্রথম ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের যেন ২০টি থাকে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল দ্বিতীয় দশকের শেষে ২০২০-তে উন্নত দেশে উত্তরণ ঘটানো। এজন্য কেবলমাত্র সুদৃঢ় অর্থনীতি নয়, এমন এক সমাজ গঠনের প্রয়োজন যেখানে ন্যায়বোধ ও মানবতার মূল্য রক্ষিত হবে। যা অর্জন করা সম্ভব উচ্চ গুণমান সম্পন্ন উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে।

বিশ্বায়নের কল্যাণে গত শতাব্দীতে অভূতপূর্ব জ্ঞান বিস্ফোরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন আবিষ্কার সারা বিশ্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অপরিমেয় আস্থা অর্জন করেছে। উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ সমাজের প্রতিটি স্তরে জীবন ও জীবনযাত্রার গুণমানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

পরিকল্পনাকারদের প্রত্যাশা ছিল দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা হবে আরো স্বচ্ছ, আরো ব্যাপক, যদি অবশ্য সরকার এ-বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ-ব্যাপারে আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং (The Earnst & Young Limited Liability Partnership) নির্দেশাবলী স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন, (ক) উচ্চশিক্ষায় ভর্তি কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে হতে হবে। (খ) উচ্চশিক্ষায় পঠনপাঠনের ভিত্তি হবে আন্তর্জাতিক মানের পাঠক্রম। (গ) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা দরকার। (ঘ) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চমানের শিক্ষকদের যাতে রেখে দেওয়া যায় সেইমত পরিবেশ সৃষ্টি করা। (ঙ) উন্নতমানের প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদান-শিক্ষালাভ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে অপেক্ষাকৃত কার্যকর ফললাভ করা সম্ভব। (চ) উচ্চশিক্ষা-শিল্পের পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

সেই শিক্ষাই কার্যকর হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের ব্যবহারিক/প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে কর্মসংস্থানের সুরাহা হয়।

প্রত্যাশা, এই নির্দেশাবলীকে অনুসরণ করে ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার এমন উত্থান ঘটানো যাতে তা শিক্ষার্থীদের কাছে ডিগ্রিসর্বস্ব না হয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের কাজে লাগে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর সময়ই বলবে 'লক্ষ্য ২০৩০' কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে!

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

আমাদের সমিতি স্বল্পসুদে কেসিসি কর্জ দাদন ও এসএইচজি কর্জ দাদন করে। বর্তমানে সেভিংস ডিপোজিট ব্যবসা শুরু করেছে।

কমলনগর এস.কে.ইউ.এস. লি.

সনাতন মণ্ডল

ম্যানেজার

Sl. No. 108

রাজ্য স্বাস্থ্যবিল ২০১৭ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

কৌশিক লাহিড়ী

একটা কথা খোলা গলায়, এবং নির্দ্বিধায় বলে রাখা ভালো যে, চিকিৎসা সংক্রান্ত এই নতুন প্রাদেশিক আইন (অথবা, পুরোনো আইনের এই নব সংস্করণ) অনিবার্য ছিল।

একটা কোথাও রাশ টানা দরকার ছিল এবং সেটা প্রশাসকের অধিকারের মধ্যেই পড়ে। তবে প্রশাসকের যতখানি, প্রদেশ বা দেশটা ঠিক ততখানিই আমার, আপনার, সকলের। দেশের নাগরিক হিসেবে কয়েকটা কথা বলাই যায়। তাতে কোনো আইন ভঙ্গের অপরাধে আশা করি সাত দিনের ফাঁসি বা তিন দিনের জেল হবে না।

পুরো নাম: West Bengal Clinical Establishment (Registration, Regularion and Transparency) Bill, 2017. ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট? কিন্তু যেখানে কোনো এস্টাব্লিশমিশমেন্ট নেই? নেই প্রথাগত 'ক্লিনিক্যাল' তকমাধারী কোনো কিছুর অস্তিত্ব? আজও আমাদের দেশের (এবং প্রদেশের) প্রতিটি প্রান্তে প্রাথমিক এবং আপদকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকেন প্রথাগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণবিহীন কিছু মানুষ, যাঁদের আমরা 'হাতুড়ে' বলে থাকি।

এঁদের মধ্যে কিছু প্রশিক্ষণবিহীন স্বশিক্ষিত মানুষ আছেন, যাঁরা সত্যি মানুষের উপকার করেন, বা অন্তত করতে চান, নিজেদের সীমিত বিচারবুদ্ধি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

আর আছেন প্রচুর ভণ্ড, ঠগ, শঠ, ভেকধারী নকল চিকিৎসক, যাঁরা প্রতিনিয়ত মানুষকে ঠকিয়ে চলেছেন। আছেন হোমিও, আয়ুর্বেদ, ইউনানী, ম্যাগনেটোথেরাপি বা আয়ুষ চিকিৎসকেরা।

তাঁদের সিংহভাগই কিন্তু বেসরকারি।

থাকবেন তো তাঁরা এই প্রশ্নের আওতায়?

কোথাও কিন্তু এই ব্যাপারটার উল্লেখ নেই।

এই একশ তিরিশ কোটির দেশে প্রতি দেড় হাজার মানুষ পিছু মাত্র একজন চিকিৎসক!

তারজন্য কি একজন চিকিৎসক দায়ী?

সেই একজন যিনি তাহলে ছোটোবেলা থেকে মনোযোগী ছাত্র বা ছাত্রী ছিলেন, মেধাবীও। পাড়ায়, ইস্কুলে কলেজে যাঁকে ভালো ছেলে বা মেয়ে বলা হতো, কৈশোর আর যৌবনের প্রায় পুরোটাই যিনি মনোনিবেশ করেছেন বইয়ের পাতায়, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতারোহণ করে ফের পাড়ি দিয়েছেন অজস্র পার্ট, সেমেস্টারের ঢেউ পেরিয়ে MBBS-এর অকূল পাথার, তারপর আবার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের যুদ্ধে জয়ী কিংবা পরাজিত হয়ে নেমেছেন জীবনযুদ্ধে!

কেউ কেউ আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা রকম পিছুটান পেরিয়ে শুধুমাত্র মেধার ওপর ভিত্তি করে পাড়ি দিয়েছেন বিলেতে, উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন, নিয়েছেন সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণ এবং তারপর ফিরে এসেছেন নিজের দেশে, হয় বাধ্য হয়ে, অথবা, আদর্শের টানে।

সেই দেশে, যেখানে 'ব্রেন ড্রেন'-কে জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান, কাউন্সিলর, এমএলএ, এমপি, প্রাক্তন মন্ত্রী এমনকি প্রাক্তন কয়েদি পর্যন্ত চিকিৎসকদের বা সংস্থাকে হুমকি দিয়ে থাকেন প্রায় জন্মগত অধিকার বশত!

তবে কি যত দোষের ভাগী শুধুমাত্র চিকিৎসকরাই? আরো নির্দিষ্ট করে বললে বেসরকারি চিকিৎসকরা?

দরকার ছিল এরকম একটি আইনের, অন্তত আইনের ভয়ের, অনেক কুলাঙ্গার অসৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ী আছেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। এই আইনে সঠিক ভাবেই সাধারণ মানুষের রক্ষা-কবচের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, চিকিৎসক সুরক্ষিত থাকবেন কোন কবচের ভরসায়? রাত ৩টে ৪৫-এ একশো কিমির বেশি গতিতে সিটবেল্ট না পরা অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে চালক আহত হওয়া আর সহযাত্রীর মৃত্যু ঘটার পর 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' বাণী-উদ্‌গাতা সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়, অথচ, প্রত্যন্ত কোনো গ্রামাঞ্চলে ঢাল-তরোয়ালহীন অবস্থায় চিকিৎসা করতে গিয়ে কোনো সরকারি চিকিৎসক যখন নিগৃহীত হন, সেই উদ্বেগের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না।

হ্যাঁ, শুধু সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা কেন, দেখতে হবে সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থাতেও। আর কেউ যেন ভুক্তভোগী না হন! কারণ, কেবলমাত্র বেসরকারি হাসপাতাল তো নয়, সাধারণ মানুষ তো সরকারি হাসপাতালেও যেতে পারেন, যানও।

তো, সরকারি হাসপাতাল কেন এই আইনের বাইরে থাকবে?

আইনসভা ছাড়াও দেশের সংবিধান-স্বীকৃত আর একটি স্তম্ভ হল বিচারসভা।

এই আইনে অভিযুক্ত চিকিৎসক বা চিকিৎসা-সংস্থা আবেদন করতে পারবেন না কোনো দেওয়ানি আদালতে, চাইতে পারবেন না বিচার। কিন্তু কেন? একজনও সৎ, পরিশ্রমী, প্রশিক্ষিত চিকিৎসক যেন অসম্মানিত না হন, না হন হেনস্থার শিকার সেটা দেখার দায়িত্ব কার?

ন্যাচারাল জাস্টিসের সূত্র মেনে একজন ফাঁসির আসামিও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়, একজন অভিযুক্ত চিকিৎসক পাবেন না কেন?

২.

গত শতকের আটের দশকের প্রথম দিকে, সদ্য রঙিন হয়ে ওঠা, সদ্য এশিয়ান গেমসোত্তর টেলিভিশনে খুব জনপ্রিয় একটি

ধারাবাহিকের কথা অনেকেরই মনে আছে।

রজনী।

মারাঠি নাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকরের কন্যা প্রিয় তেন্ডুলকর নাম ভূমিকায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। মিডিয়াকাশে সচিন আবির্ভূত হবার আগে আমরা তেন্ডুলকর বলতে বিজয় আর প্রিয়াকেই বুঝতাম।

খুব উচ্চমানের অভিনয় বা পরিচালনা নয়, রজনী, তিন দশক পেরিয়ে আজও স্মৃতিতে অমলিন অন্য কারণে।

সমাজ বদলের ডাক না দিয়েও, কীভাবে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অন্যায়, অবিচার, শোষণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো যায়, রজনী তারই প্রতীক হয়ে ওঠেন।

প্রতি সপ্তাহে রজনীর মাধ্যমে লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের চেপে থাকা ক্ষোভ-দুঃখ-হতাশা-ক্রোধ মুক্তি পেত। রজনী হয়ে উঠতেন, সাধারণ মানুষের (আরো নিখুঁত করে বললে, উপভোক্তার, যদিও এই শব্দটা তখনও চালু হয়নি) ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম।

প্রেসার কুকারের ভাল্‌ব।

সমাজ বদলায়নি একবিন্দুও, শুধু আমাদের ইচ্ছেপূরণটা হয়ে চলতো প্রতি সপ্তাহে।

আর বুড়ো, নড়বড়ে সমাজটা একটু একটু করে বেঁচে যেত।

ঠিক এই ব্যাপারটাই তার আগের দশকে আরো সফলভাবে করেছিলেন যুগপুরুষ অমিতাভ বচ্চন তাঁর একের পর এক ছবিতে দেখানো দুষ্টের দমনের মাধ্যমে।

এই অ্যাংরি ইয়ংম্যান ইমেজ তৈরি করা হয় (হয়তো খুব সচেতনভাবে নয়), সমাজের নিচের তলার পুঞ্জীভূত রাগ-আক্ষেপ-হতাশা-ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমান-আক্রোশকে সুরক্ষিতভাবে বার করে দেওয়ার জন্য।

সমাজ বদলাতো না, শোষণ চলতেই থাকতো, শুধু আবরণ বদলাতো মাত্র। কিন্তু ওই অমিতাভ বা প্রিয়া নামের সেফ্‌টি ভাল্‌বের বাষ্প উদ্গীরণের জন্য শোষণটা সহনীয় হয়ে উঠতো, সাময়িকভাবে হলেও।

এযুগে এটাই বোধহয় দস্তুর।

তাই রাজনীতিকরাও খুব নিখুঁতভাবে অবতীর্ণ হন জনতার মুখের ভূমিকায়।

মানুষ তখন সেই মুখের মধ্যে নিজেকে খোঁজে।

সে মুখ কখনো মুক্তিসূর্য ইন্দিরার, আগুনখেকো বামপন্থীদের বা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের, বাজপেয়ী, কেজরিওয়াল, কানহাইয়া, মোদী বা মমতার।

আর ইতিহাসের সেই নির্দিষ্ট লগ্নে, সেই মুখটিকে ঘিরে জনমানসের গ্যালারি জুড়ে মেক্সিকান ঢেউয়ের চমকপ্রদ উত্থান এবং পতন।

আমরা সবাই জানি, বুঝি যে সমাজবিপ্লব আসেনি, সমাজ বদলায়নি, এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচন আর দুর্নীতি। মূর্খ, দাম্ভিক, অসৎ, কৃমিকীট, পরজীবী, ভণ্ড আর শয়তানে ভরে উঠছে বিশ্ব চরাচর।

মধ্য আর নিম্নমেধার আস্ফালনে পৃথিবী আজ ক্লান্ত ধ্বস্ত।

তাও আমরা ভাবতে ভালোবাসি, চিকিৎসক, শিল্পী, শিক্ষক, কবি, দার্শনিকরা অন্তত এই রৌরব নরকের ছোঁয়া মুক্ত, যেন তাঁরা অন্য গ্রহের মানুষ! প্রতিদিন একটু একটু করে হেরে যেতে যেতেও আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে আমাদের নেতা-নেত্রীরা সত্যিই সততার প্রতিমূর্তি, যে রাজনৈতিক দলটিকে আমি সমর্থন করি তাঁরা গঙ্গাজলবিধৌত তুলসীপত্র।

সমাজ টিকিয়ে রাখতে এই সেফ্‌টি ভাল্‌বের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আশা করি, যেভাবে তাঁরা বেসরকারি হাসপাতালের চোখের চামড়াহীন জোচ্চুরিকে সঠিকভাবে বেপর্দা করছেন, ঠিক একইভাবে সরকারি হাসপাতালের যাবতীয় নোংরামি, দুর্নীতির ভিমরুলের চাকেও ঢিল মারা হবে, ঠিক যেভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে ফোন করে বেসরকারি হাসপাতালকে সরাসরি হুমকি দিয়ে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করা হল, ঠিক একইভাবে সংবাদমাধ্যমকে ডেকে যাবতীয় চিটফান্ডের মালিকদের, সিন্ডিকেটের তোলাবাজদের আর শিক্ষক নিয়োগের নামে ঘুষখোরদের ফোন করে, নাম ধরে ধরে সমস্ত ঠকে যাওয়া মানুষগুলোকে টাকা ফিরিয়ে দেয়া হবে। আশা করবো।

কারণ, আশায় বাঁচে চাষা, চিকিৎসকও।

আর চিকিৎসক না বাঁচলে কেউ বাঁচবে না।

৩.

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে সেরা চিকিৎসকদের পাওয়া যায়, ন্যায্যমূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়, তবুও এত বিপুল সংখ্যায় সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত কেন বেসরকারি হাসপাতালে যান, এর কারণ কী?

সেই মূল প্রশ্নটা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি না তো!

গত শতকের শেষ দিকে বহু সাধ্যবিত্ত মানুষ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ঘটিবাটি বিক্রি করে দক্ষিণে ছুটতেন চোখ, কিডনি, হার্ট বা ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য।

কিছুটা হলেও সেই পরিস্থিতি বদলেছে।

আজ, এই মহানগরে শুধু নয়, কিছু কিছু জেলা শহরেও মেলে সর্বোচ্চ মানের সুচিকিৎসা, শুধু বেসরকারি নয়, সরকারি হাসপাতালেও।

ব্যক্তিগতভাবে একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রতিদিন বেশ কিছু রোগী দেখি যাঁদের ওই দক্ষিণের বা দেশের অন্য কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরই কোনো চিকিৎসক-বন্ধু আমাদের কাছেই রেফার করছেন, কারণ সেই একই উন্নত পরিষেবা বা অভিজ্ঞতা এই শহরেই মেলে।

এটা এক দশক আগেও ভাবা যেত না।

অনেক খামতি থাকলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের নবতম উদ্ভাবনগুলির অনেকগুলিই আজ আমাদের হাতের নাগালে। এই শহরে, এই রাজ্যে।

প্রতিবেশী রাজ্য এমনকি আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে চিকিৎসাপ্রার্থী মানুষের ঢেউ প্রতিদিন আছড়ে পড়ে এই বেসরকারি হাসপাতালগুলির বাহারি চত্বরে।

কেন?

কর্পোরেট হাসপাতাল জনসেবার চেয়ে ধনসেবা যে বেশি করবেন, সেটা জনা কথাই। ওই স্তরের পরিষেবার খাতিরে চিকিৎসা বহুমূল্য হবে এটাও মেনে নেওয়া যায়।

কিন্তু যেটা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না, সেটা অসততা, নীতিহীনতা। সেটা বরদাস্ত করা উচিত নয়।

কিন্তু দেখতে হবে ঠগ বাছতে গিয়ে যেন গাঁ উজাড় না হয়ে যায়!

আগে ঘটিবাটি বিক্রি করে মানুষ দক্ষিণে ছুটতেন সুচিকিৎসার আশায়, আজ হয়তো আর কথায় কথায় দক্ষিণে ছুটতে হয় না, কিন্তু ঘটিবাটি আজও বিক্রি করতে হয়, তার একটা কারণ যদি বহুমূল্য আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার হয়, অন্য কারণ অবশ্যই জোচ্চুরি।

তবে এই সরকারি-বেসরকারি তরজার শিবারবে চাপা পড়ে যাচ্ছে একটা মূল প্রশ্ন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সত্তর বছর পরে আজও কেন স্বাস্থ্যের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হল না?

আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি না কি?

কেবলমাত্র একজন চিকিৎসক কেন, কোনো হাতুড়ে ডাক্তারও কখনোই চাইবেন না তাঁর চিকিৎসায় কারো ক্ষতি হোক। মৃত্য তো আদৌ কাম্য হতে পারে না।

অধীত বিদ্যায় ভর করে অসুস্থ মানুষটিকেসারিয়ে তোলা ছাড়া একজন চিকিৎসক কী-ই বা চাইতে পারেন!

চিকিৎসায় গাফিলতিমাত্রই অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু তার জন্য কোনো চিকিৎসককে কি অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলায় অভিযুক্ত করা যায়?

এই লেখায় ইতি টানার আগেই সুপ্রিম কোর্টের একটি যুগান্তকারী রায়দানের কথা মনে করা যেতে পারে—

In the Supreme Court of India

Civil Appellate Jurisdiction: Civil Appeal No. 3541 of 2002

Martin F. D'souza …Appellant Vs Mohd. Ishfaq …Respondent

Judgment: Markandey Katju, J.

New Delhi; February 17, 2009

No prompt arrest of doctors on Medical Negligence

Noting that frivolous complaints against doctors have increased by leaps and bounds, the Supreme Court on Tuesday 17th February 2009 held that the police cannot arrest doctors over complaints of medical negligence without prima facie evidence. The apex court also restrained courts, including consumer fora, from issuing notices to doctors for alleged medical negligence without seeking an opinion from experts. "While this court has no sympathy for doctors who are negligent, it must also be said that frivolous complaints against doctors have increased by leaps and bounds in our country particularly after the medical profession was placed within the purview of the Consumer Protection Act," the court said. A bench of Justices Markandeya Katju & R M Lodha ruled that courts must first refer complaints of medical negligence to a competent doctor or a panel of experts in the field before issuing notice to the allegedly negligent doctor. "This is necessary to avoid harassment to doctors who may not be ultimately found to be negligent. We further warn the police officials not to arrest or harass doctors unless the facts clearly come within the parameter laid down in Jacob Mathew's case, otherwise the policemen will themselves have to face legal action," the apex court said.

এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে জ্যাকব ম্যাথ্যুর কেসে বিচারপতির রায়ের কথাগুলি—

As observed by the Supreme Court in Jacob Mathew's case :

''A medical practitioner faced with an emergency ordinarily tries his best to redeem the patient out of his suffering. He does not gain anything by acting with negligence or by omitting to do an act. Obviously, therefore, it will be for the complainant to clearly make out a case of negligence before a medical practitioner is charged with or proceeded against criminally. A surgeon with shaky hands under fear of legal action cannot perform a successful operation and a quivering physician cannot administer the end-dose of medicine to his patient.

''If the hands be trembling with the dangling fear of facing a criminal prosecution in the event of failure for whatever reason - whether attributable to himself or not, neither can a surgeon successfully wield his life-saving scalpel to perform an essential surgery, nor can a physician successfully administer the life-saving dose of medicine. Discretion being the better part of valour, a medical professional would feel better advised to leave a terminal patient to his own fate in the case of emergency where the chance of success may be 10% (or so), rather than taking the risk of making a last ditch effort towards saving the subject and facing a criminal prosecution if his effort fails. Such timidity forced upon a doctor would be a disservice to society.''

With best compliments of

M/s. R.K. MONDAL & BROTHERS

COAL AND SAND TRANSPORTER & CIVIL CONTRACTOR

Vill. & P.O. Kajora Gram, Dist. Paschim Bardhaman
M : 7872222999 (Piklu), 7797333999 (SC), 9434580940

Sl. No. 119

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G.T. Road, Main Gate, Durgapur-713203, Phone : 0343-2582381
Contact : AMIT SINGH, 9434647691, 7699999426

Sl. No. 163

জিন-নিকোলাস-জিনোম

গীষ্পতি চক্রবর্তী

নিকোলাস ভোকার জায়গা করে নিল ইতিহাসের পাতায়। কে নিকোলাস ভোকার? ২০১১ সালে তাঁর বয়স ছিল চার বছর। চার বছরের শিশু কী এমন করতে পারে, যা তাকে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে দেবে?

নিকোলাস ভোকার কিছু করেনি। সে বিখ্যাত হয়ে গেল তার একটি জিনের এক বিশেষ ত্রুটির জন্য। বেচারা শিশুটির যে জিনটি ত্রুটি বহন করছিল তার নাম X1AP। এরকম অদ্ভুত নাম তো কোনো মানুষের হয় না! কিন্তু মানুষের শরীরের কোষের ভেতর, নিউক্লিয়াসের গভীরে যে জিনগুলি সবার চোখের আড়ালে বসে গোটা মানুষটার নিয়ন্ত্রক বস্তু হিসেবে কাজ করে চলেছে, তাদের নানা নামে বিজ্ঞানীরা ডাকেন। ওই অদ্ভুত নামটি ওই নামগুলির একটি। এরকম জিন কত আছে আমাদের কোষে? প্রায় পঁচিশ হাজার জিন নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে শরীরের নানা কাজ-কারবার। আর হাজারো কাজের জটিল ছন্দ ভেঙে যায় যদি এইসব জিনের কোনো একটিতে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে। নিকোলাস ভোকারের শরীরে ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছিল। সে এক জটিল রোগে পর্যুদস্ত হচ্ছিল।

২০১১ সালে আমেরিকার উইসকনসিনে DNA সিকোয়েন্সিংকে কাজে লাগিয়ে ডাক্তাররা এক জটিল রোগের চরিত্র নির্ধারণে সফল হলেন ও তার চিকিৎসাও সম্ভব হল।

আমাদের শরীরে আছে প্রায় পঁচাত্তর থেকে একশো ট্রিলিয়ন কোষ। এক ট্রিলিয়ন বলতে বোঝায় দশ লক্ষ গুণিতক দশ লক্ষ। এই সংখ্যা আমাদের কল্পনার বাইরে। অথচ এই সমস্ত কোষ সুন্দরভাবে কাজ করে চলেছে শরীরের সবকিছু ঠিকঠাক রাখার জন্য। শরীরের সব বিপাকীয় কাজ চলছে এই জিনের নির্দেশে। আবার কোন জিন কী কাজ করবে তাও ঠিক করা আছে জিনের গঠনের মধ্যে। জিনের গঠনের মধ্যে নিউক্লিওটাইড বলে এক জটিল রাসায়নিক আছে। জিনের প্যাচানো সিঁড়ির মতো চেহারাটা আজ স্কুলের ছাত্রদের চেনা। কিন্তু ওই প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো ছবির মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক কিছু। ওই সিঁড়ির ধাপ তৈরিতে নিউক্লিওটাইডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একদিকের নিউক্লিওটাইড অপর দিকের নিউক্লিওটাইডের সঙ্গে জুড়ে তৈরি করে সিঁড়ির ধাপ। এই ধাপের শরীর গড়ে ওঠে এক ধরনের বেস বা ক্ষারকের দ্বারা। জোড়ায় জোড়ায় লম্বা পেঁচানো সিঁড়ি দু-চারটে ধাপ দিয়ে তৈরি হয়নি। আমাদের শরীরের সব বেস গুণলে পাব প্রায় তিনশ কোটি জোড়া নিউক্লিওটাইডের অণু। এর কোনো একটি জায়গায় কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে তা প্রতিফলিত হতে পারে যে-কোনো জিনের মধ্যে। স্বাভাবিক বেস-এর কোনো একটি মিউটেশনের দ্বারা পরিবর্তিত হলে তা সমগ্র শারীরবৃত্তীয় কাজে প্রভাব ফেলতে পারে প্রভূত পরিমাণে। কোনো একটি জিনের একটি

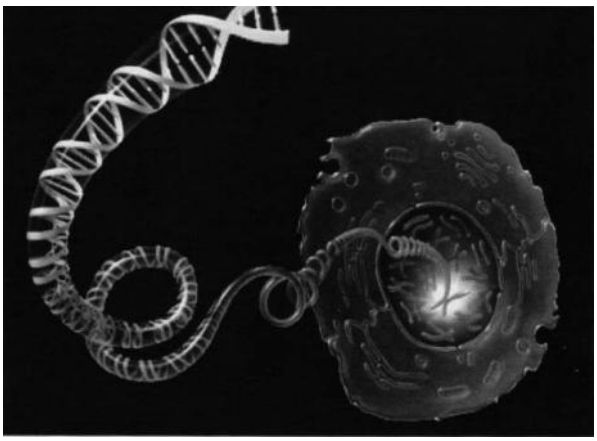

নিউক্লিউটাইডের জায়গায় অন্য নিউক্লিওটাইড থাকলে, তা সমগ্র শারীরিক কার্যপ্রক্রিয়ায় জটিল প্রভাব ফেলতে পারে ও সেই মানুষটি নানাভাবে অসুখের শিকারে পরিণত হয়। নিকোলাস ভোকারের ক্ষেত্রে একটি জিনের ত্রুটি তাকে অসুস্থ করে তুলেছিল।

আজকের দিনের যে চেহারাটা আমাদের কাছে পরিচিত, তা বুঝতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। বহু বিজ্ঞানী চেষ্টা চালিয়েছেন বহু বছর ধরে জিনের চেহারাটা বুঝতে। শিকে ছিঁড়ল একসঙ্গে দু-জনের ভাগ্যে। একজন ওয়াটসন ও অপরজন ক্রিক। আজকের দিনের জিনের চেহারাটাকে বলা হয়—ওয়াটসন-ক্রিক মডেল। এর জন্য নোবেল পেলেন ওই দুই বিজ্ঞানী। তারপর বহু জল গড়িয়েছে নদীতে। আজকের জিন-বিদ্যা অনেক এগিয়েছে। এখন আমরা জিন-সিকোয়েন্সিং-এর যুগে।

হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট তার কাজ শেষ করে ২০০৩ সালে। শেষ করার অর্থ এই নয়, যে এই প্রজেক্টে আর কিছু করার নেই। বরং বলা ভালো, কাজের সবে শুরু। দশ বছরের বেশি সময় ধরে এই প্রকল্প যে কাজ শেষ করল, তা হল মানুষের সমস্ত DNA গঠনের ছবিটা সবার সমানে তুলে ধরল। এই কাজ সমাধা করতে খরচ হল প্রায় তিনশো কোটি ডলার। এমন কয়েকশো ডলার খরচ করলে আপনি আপনার জিনের গঠনের অনেক কিছু জানতে পারবেন। আপনার লালার সঙ্গে মুখের ভেতরের যে কোষগুলো খসে পড়ে, সেই কোষ থেকেই এই কাজ করা সম্ভব। এখন এই পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার পূর্বপুরুষের কোন ধারা আপনি অনুসরণ করছেন আপনার শরীরে, তা জানা সম্ভব। আরও সম্ভব, ডায়াবেটিস বা ওই জাতীয় রোগের সম্ভাবনা আপনার কতটা তা জানা। এর পাশাপাশি আছে নতুন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি প্রকরণ। বর্তমানে এই জাতীয়

কাজে ন্যানোটেকনোলজির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। ন্যানোপোর টেকনোলজি খুব সহজেই অতি সামান্য পদার্থ অতিক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চালিয়ে জেনেটিক বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে আলাদা করে তাকে সিকোয়েন্সিংয়ে কাজে লাগাতে পারে। জিন সিকোয়েন্সিং ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগতে পারে। নির্দিষ্ট জিনের চরিত্র ভালোভাবে বুঝতে ও টিউমারের চরিত্র ভালোভাবে জানতে জিন সিকোয়েন্সিং সাহায্য করতে পারে।

মানুষ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে? কোথা থেকে, কীভাবে, কোথায় আমরা এসে জড়ো হয়েছি? আমাদের পূর্বপুরুষ কারা ছিল? আমরা কতটা নানা জায়গার মানুষের মিশ্রণ? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এক সময়ে গুহাচিত্র, শিলালিপি, শরীরের নানা গঠনবৈচিত্র্য পরীক্ষা করেছি আমরা। জিন সিকোয়েন্সিং আমাদের এই কাজ সহজ করে দিয়েছে। জিনের গঠনবৈচিত্র্য আমাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র খুঁজে বার করতে সাহায্য করছে।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের জেনোগ্রাফিক প্রকল্প জিন সিকোয়েন্সিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার ধরন বুঝতে সাহায্য করছে। প্রায় দেড় লক্ষ জেনেটিক মার্কারের সাহায্যে একজন মানুষ বুঝে নিতে পারে, তার পিতৃ ও মাতৃকুল কোথা থেকে এল, এবং কীভাবে তার পূর্বপুরুষ ছড়িয়ে পড়ল নানা প্রান্তে। প্রায় সাত লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। অর্থাৎ, সাত লক্ষ মানুষের মুখের ভেতর থেকে কোষের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ও তা পরীক্ষা করা হয়েছে। কাজের পরিধি অবহেলা করার মতো নয়।

তবে জিন নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে। অস্ট্রিয়ার একজন চার্চের সাধু ও উদ্ভিদবিদ্যায় উৎসাহী মানুষ, গ্রেগর মেন্ডেল ছোলা গাছের ক্রস-পলিনেশনের পর, গাছের ওই প্রজন্মের মধ্যে এমন কিছু চরিত্রের হেরফের লক্ষ করলেন, যা তাকে বংশগতির ধারায় বিশেষ বিশেষ চরিত্রের প্রতিক্রিয়ার ধারণা এনে দিল। বংশগতির প্রাথমিক ধারণা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে উঠল মেন্ডেলের হাত ধরে। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বোঝা গেল ক্রোমোজম বংশগতির ধারা বয়ে নিয়ে যায় এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। ১৯৪১ সালে জিন-বিশারদ জর্জ বিড্‌ল ও জৈব রসায়নবিদ এডওয়ার্ড টাটুম দেখালেন প্রোটিন তৈরিতে জিনের ভূমিকাই প্রধান জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বহু বিজ্ঞানী এরপর ক্রোমোজম ও জিনের কাজ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। তবে নোবেল প্রাইজের শিকে ছিঁড়ল ক্রিক ও ওয়াটসনের ভাগ্যে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন যৌথভাবে ১৯৬২ সালে। তবে তৃতীয় আর একজনও এই নোবেলের অংশীদার। তাঁর নাম মরিস উইলকিন্‌স্। তবুও সাধারণভাবে ডিএনএ-র গঠনশৈলী ওয়াটসন-ক্রিক মডেল বলে পরিচিত। একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। তা হল ফ্রান্সিস ক্রিক ছিলেন ফিজিক্স বা ভৌতবিজ্ঞানের ছাত্র। এর পাশাপাশি আর একজনের নাম উল্লেখ করা উচিত। তিনি রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন, পেশায় মাইক্রোবায়োলজিস্ট। ১৯৫০ সালে উনি X-Ray Crystalography-র মাধ্যমে ডিএনএ-র পেঁচানো গঠন সম্পর্কে অলোকপাত করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা নোবেল পান, তাদের কাজের পেছনে বহু বিজ্ঞানীর উল্লেখযোগ্য পরোক্ষ অবদান থাকে। এঁরা থাকেন পর্দার আড়ালে। বিজ্ঞানের জগতে এ ঘটনা বিরল নয়।

হিউম্যান জেনোম প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা যে প্রায় পঁচিশ হাজার জিনের খোঁজ পেয়েছি, তার মধ্যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগের কাজ জানা গেছে। বাকি জিনের কাজ জানার প্রক্রিয়ায় সারা বিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের শরীরের ডিএনএ-র গঠন-বৈচিত্র্য অনুসন্ধান শুরু হয়েছে এক নতুন পদ্ধতিতে। তার নাম হ্যাপম্যাপ ক্যাটলগ। এসবের পাশাপাশি বিজ্ঞানের আর-এক শাখা জিনের ওপর নানা কারিকুরি শুরু করল। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জিনের ওপর খবরদারির এক নতুন শাখা হিসেবে উঠে এল। কৃষকরা যখন থেকে ক্রস-পলিনেশন শুরু করেছে, তখন থেকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শুরু। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের কৃৎকৌশল কাজে লাগিয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আধুনিক চেহারাটা সবার সামনে এল যখন স্ট্যানলি এন কোহেন এবং হার্বার্ট ডব্লু বয়ার ১৯৭৩ সালে ই.কোলি ব্যাকটেরিয়ার জিনে ডিএনএ যুক্ত করলেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আধুনিক যুগের সূচনা হল। বর্তমানে কৃষি ও শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার সকলেরই জানা। ওষুধশিল্পে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিপ্লব ঘটিয়েছে। এমন আণুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়াকে বলা যায় অতিক্ষুদ্র কারখানা, যেখানে দিনরাত কোনো বস্তুর উৎপাদন হয়ে চলেছে। এর মধ্যে ইনসুলিনের নাম আসে সবার আগে। এ ছাড়া, জ্বালানি অ্যালকোহল, নানা ধরনের তন্তু তৈরিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

বংশপরম্পরায় ডিএনএ নানাভাবে নানা ধরনের পুনর্গঠনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এসবের মধ্যে Y-ক্রোমোজম প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় বাবা থেকে ছেলেতে চলে আসে। Y-ক্রোমোজম নির্ধারণ করে সন্তানের লিঙ্গ। Y-ক্রোমোজম থাকলে পুরুষ, ও না থেকে যদি দুটি X-ক্রোমোজম থাকে, তাহলে সন্তান মেয়ে হয়ে জন্মায়। পুরুষের লিঙ্গনির্ধারক ক্রোমোজমের ধরন হল 'XY', মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হল 'X'। ছেলের জন্ম দিতে না পারার জন্য আজও বহু মেয়েকে নির্যাতিত হতে হয়। কিন্তু পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণ করে যে 'Y' ক্রোমোজম তা আসে পুরুষের শুক্রানুর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকা গৌণ। স্ত্রী শুধুমাত্র 'X' ক্রোমোজম দিতে সক্ষম। বধূ নির্যাতনের বহু ঘটনার নিরসন হতে পারে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্যে। শিক্ষার বিষয়টি, বিশেষ করে বিজ্ঞান-শিক্ষার আলোয় সমাজের এই অন্ধকার দূর হতে পারে।

আমাদের কোষে মাইটোকনড্রিয়া নামে এক অঙ্গাণু আছে, যার ভেতর কোষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎপাদন হয়। একে কোষের 'পাওয়ার হাউস' বলা যেতে পারে। এছাড়া মাইটোকনড্রিয়ার ভেতর আছে কিছু ডিএনএ। এই ডিএনএ প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় বংশপরম্পায় এক জনের শরীর থেকে আর একজনের শরীরে চলে আসে। আশ্চর্য বিষয় হল, মানুষের শরীরের এই ডিএনএ-কে ধরে জিন-বিশারদরা সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষের অনুসন্ধানে সফল হয়েছেন। ডিএনএ-কে ধাওয়া করে দু-জন আফ্রিকানের সন্ধান পেয়েছেন জিন-বিশারদরা। মাইটোকনড্রিয়ার ডিএনএ-র ধারক এক নারী, যিনি প্রায় ষাট হাজার বছর আগে আফ্রিকার কোনো এক জায়গায় বাস করতেন। আর 'Y' ক্রোমোজমের যে পরম্পরা আমাদের সুদূর অতীতের অন্ধকারে আলো ফেলতে সাহায্য করেছে সেই আলোর রেশ খুঁজে বার করেছে প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগের কোনো এক পুরুষকে যে আজও বেঁচে আছে আমাদের মধ্যে জিনের মাধ্যমে। মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করার এতবড় ব্যাপারটা অবহেলা করার বিষয় নয়। পৃথিবীর যে প্রান্তের, যে বিশ্বাসের মানুষই হই না কেন, ডিএনএ-র হাত ধরে আমরা সবাই পৌঁছে যাব আফ্রিকার কোনো এক প্রান্তে, যেখানে সব বিভেদ মুছে যাবে। আমরা দেখব, আমরা সবাই বিযুক্ত, নেহাতই পরস্পরের কাছে অচেনা, দূর দেশের মানুষ নই। আমরা খুবই কাছের মানুষ সবাই। শুধু এটুকু আমাদের অজানা ছিল। জিনের অনুসন্ধান আমাদের নির্ভুলভাবে কাছাকাছি

এনে দিয়েছে। আর যে যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এসব কাণ্ড করে চলেছেন, তাকে মিথ্যা বলার পাল্টা যুক্তি আপাতত আমাদের হাতে নেই। তাই মানতেই হয়, আমাদের অফ্রিকার পূর্বপুরুষদের। তবে এসবের দিকে পিঠ দিয়ে বিশ্বাস আঁকড়ে যারা বাঁচতে চান তাদের কথা আলাদা। যে জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগাবে কে? আমরা যে ডিএনএ নিয়ে এত কথা বলছি, আজ হাজার ল্যাবরেটরিতে মানুষের যে জিন নিয়ে চুলচেরা বিচার করছি তা হল হোমো সেপিয়ান্স বা আজকের মানুষের জিন। সুদূর অতীতে প্রায় মানুষের মতো, যাদেরকে বলা যায় প্রথম পর্যায়ের মানুষ, বাস করতো এই পৃথিবীতে। এখনও পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, তারা ছিল পনেরোটি ভিন্ন প্রজাতির মানুষের রকমফের। এদের মধ্যে বিবর্তন শুধু টিকিয়ে রাখলো হোমো সেপিয়ান্সকে, অর্থাৎ আমাদের। বাকি সবাই অবলুপ্ত হল। প্রায় দুলক্ষ বছরের ইতিহাস বয়ে চলেছে আমাদের জিনের গভীরে। এই জিনের পথচলা শুরু হয়েছে পূর্ব আফ্রিকা থেকে। ওখানেই আমাদের পূর্বপুরুষের প্রথম পায়ের ছাপ লুকিয়ে আছে। ওখান থেকেই আমরা ছড়িয়ে পড়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। আজ আমরা ছড়িয়ে পড়তে চাইছি মহাবিশ্বের বিভিন্ন দিকে। পৃথিবী ছাড়িয়ে আজ মহাবিশ্বকে আমরা আমাদের ঘর হিসেবে ভাবতে শুরু করেছি। এই যে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা, সে ইচ্ছার জন্ম হয়েছে হোমো সেপিয়ান্সের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছার আগে। চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়া, নতুন জায়গা অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে খুঁজে বার করার মন তৈরি হয়েছিল হোমো এরেকটাস প্রজাতির মধ্যে। আজকের মানুষের সরাসরি পূর্বসূরি হোমো এরেকটাস নয়। তবুও আমাদের সঙ্গে তাদের কিছু মিল ছিল। প্রায় আঠারো লক্ষ বছর আগে তারা আফ্রিকা ছেড়ে এখনকার ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর বিবর্তনের জটিল নিয়মে এরা চলে গেল অবলুপ্তির পথে। সে এক অন্য ইতিহাস।

উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজনন মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে বহু শতাব্দী ধরে। তখন জিনের কথা জানা ছিল না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা বংশপরম্পরায় সঞ্চিত হয়ে বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ন্ত্রিতভাবে মানুষ তৈরি করেছে তার ঘরে, চাষের মাঠে। কিন্তু সরাসরি ডিএনএ-কে পরিবর্তিত করে খাদ্যের গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ করা নতুন ঘটনা নিঃসন্দেহে।

১৯৯৪ সালে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে নতুন ধরনের টমাটো বাজারে ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে। খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে মার্কিনিরা খুব খুঁতখুঁতে। তাদের এই বিশুদ্ধতার বাতিক ওই দেশের সরকারকে বাধ্য করেছে খাদ্য, ওষুধ এসবের গুণাবলী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে। এফডিএ এজন্য খুব সতর্ক। তাদের ছাড়পত্র পাওয়া টমাটো তাই তেমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি। তবে গ্রেট ব্রিটেনে সাধারণ মানুষ মেনে নিতে চায়নি এই টমাটোর পেস্টকে। তারা সন্দিগ্ধ এই জিন প্রযুক্তির খাবার সম্পর্কে। এক সময় যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, তাদের কথা এখনও কান পেতে শোনে সারা বিশ্ব। ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে 'জিএম ফুড' বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ফুড বা খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সারা বিশ্বে। এই জিএম ফুড সম্পর্কে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মার্কিনিদের চেয়েও কড়া। ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে জিএম ফুড খুব বেশি বাজার দখল করতে পারেনি। জিএম ফুডকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের আন্দোলন পৃথিবীর বহু দেশের সরকারকে বাধ্য করেছে এই খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে ভাবতে। সরকার, বাজার ইত্যাদি কচকচির বাইরে শুধু বিজ্ঞানচর্চার দিকে তাকালে বলা যায়, ভবিষ্যতে জিন-নিয়ন্ত্রিত খাদ্য

হয়তো মানুষের প্রতিদিনের স্বাভাবিক খাদ্যে পরিণত হবে। এক ধরনের সোনালি চাল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে জিন-প্রযুক্তির মাধ্যমে। যেখানে ভিটামিন 'এ' তৈরির উপাদান বিটা ক্যারোটিন চালের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এক ধরনের ছত্রাক জিন-প্রযুক্তির প্রয়োগে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যারা ওমেগা-থ্রি-ফ্যাটিঅ্যাসিড পাঁউরুটিতে যুক্ত করবে; আর ওই যৌগ যে মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, তা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অজানা নয়। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, জিন-প্রযুক্তি মশার অসুখ-বহন ক্ষমতা কমাতে সক্ষম হবে। এভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে জিন-প্রযুক্তি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে আমাদের সামনে। তবে এর বিপদের দিকও আছে। তাত্ত্বিকভাবে এটা বলা যায়, জিন-প্রযুক্তির প্রয়োগ এমন জীবাণুর জন্ম দিতে পারে যারা আমাদের হাতের কাছের কোনো ওষুধে মরবে না। সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক্স রেসিসট্যান্ট কথাটা আজ সকলেরই জানা। ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে জিন প্রযুক্তি রেসিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া অনায়াসে তৈরি করতে পারবে। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে সেই জীবাণু ব্যবহৃত হবে না, একথা কে বলতে পারে? সারা বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি। তাই জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ কোন খাতে বইবে বেশি তা নির্ভর করে সরকারগুলির শুভবুদ্ধির ওপর। আর পৃথিবীর যে-কোনো দেশের সরকারের শুভবুদ্ধির ওপর সেই দেশের জনগণ খুব একটা ভরসা করে বলে মনে হয় না।

জিন প্রযুক্তি আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে নতুন দিগন্ত। এই প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্ভাবনা এখনও শৈশবের স্তরে। পূর্ণ বিকাশের স্তরে এই প্রযুক্তি কী আকার নেবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কম্পিউটারের উদ্ভাবনের সময় কে ভেবেছিল ঘরে ঘরে কম্পিউটার আজ মামুলি যন্ত্রে পরিণত হবে? তেমনি সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে জিন প্রযুক্তির মধ্যে। আমাদের কৃষি, আমাদের শিল্প এখনও পড়ে আছে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির থেকে শত যোজন পেছনে। কম্পিউটার ও জিন প্রযুক্তির কোনো অজানা মেলবন্ধন সম্ভাবনার কোন গ্রহে আমাদের নিয়ে যেতে পারে তা আমরা এখন ভাবতেও পারছি না। কল্পবিজ্ঞানের হাত ধরে হয়তো নতুন কিছু করার কথা ভাববো। বহু লক্ষ বছর আগে যে-সব মানুষের মতো প্রজাতি মানুষের সঙ্গেই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, কিংবা বলা যায় সীমা অতিক্রম করার কোনো এক চরিত্রের জিনগত তাগিদে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে, সেই পুরোনো তাগিদের ধাক্কায় মানুষ হয়তো মনের কোনো এক গভীর গহ্বর থেকে ভাঙতে চাইছে আমাদের জ্ঞানের চেনাজানা পরিধিটা। হয়তো জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্র, নতুন জীবনের মানচিত্র তৈরি হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেঁচে থাকবে নতুন প্রযুক্তির যুগে। জিনের হাত ধরে আমরাও অন্যভাবে থেকে যাব ভবিষ্যতের মানুষের মধ্যে। সুদূর অতীত থেকে আমরা এভাবেই তো এসে পৌঁছেছি আজকের এই বর্তমানে।

With best compliments of

JAISHREE TIMERS

MILL
Amrasota More, Suri Road
P.O. Searsole Rabari-713358
Phone : 0341-2444002
E-mail : jaishreetimbers@rediffmail.com

RESI
18/1, N.S.B. Road
P.O. Raniganj (W.B.)
Phone : 0341-2449707
Fax : 0341-2444019

Sl. No. 165

With best compliments of

DURGAPUR CONSTRUCTION

MECHANICAL, STRUCTURAL & PIPE LINE CONTRACTOR

J.P. Avenue, Durgapur-713211, Dist. Burdwan

Sl. No. 168

দরবারি ঝুমুর ও পদকর্তা মহাজনেরা

অশোক দাস

রাজমহল থেকে এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণি এবং গৈরিক পার্বত্য ভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হয়ে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত বেষ্টন করে একেবারে ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর, বালেশ্বর স্পর্শ করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই শৈলমালা এবং গৈরিক মালভূমিই সাঁওতাল পরগণা (পাকুড়-গোড্ডা-সাহেবগঞ্জ-দেওঘর-দুমকা-জামতাড়া), ছোটোনাগপুর, মানভূম, সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জ-বালেশ্বর কেন্দ্রের শৈলমালা, অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি, এবং বাংলার স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমারেখা। এই সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিল ভূমি-রাজ্যগুলি। উত্তর-পশ্চিমে বীরভূম (বির্‌ভূম), দক্ষিণ-পশ্চিমে মানভূম ছাড়াও ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্মকর্ম-পালাপার্বণে জনগোষ্ঠীর কৌমবিন্যাসে এই অঞ্চলের ধলভূম-তুঙ্গভূম-মল্লভূম-সামন্তভূম-শিখরভূম-বরাহভূম-সিংভূম (সিংহভূম নয়) প্রভৃতি ভূমিরাজ্যগুলি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এ বিষয়ে অন্যান্য সবার সাথে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. সুধীরকুমার করণও একমত। পূর্বভারতের এই প্রাচীনতম ভূখণ্ডটিতে দীর্ঘকাল বাস করে আসছেন ভূঞা-ভূমিজ-মাহাতো-বাগদি-বাউরি-লায়েক-মাল-মালপাহাড়ি, সেই সঙ্গে অস্ট্রিকভাষী সাঁওতাল-মুণ্ডা-ওরাঁও। শাল-মহুয়ার বন, পাহাড়-নদী-মাঠ-ঘাট-নালা বেষ্টিত এই অঞ্চলে বসবাসকারী এই সব মানুষেরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন। কুড়মি-মাহাতোদের ভাষাকে 'কুড়মালি' আখ্যা দিয়ে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলেও এ ভাষাও যে ঝাড়খণ্ডি বাংলারই একটি রূপ ভাষাবিদরা বিশ্লেষণ করে তা প্রমাণ করেছেন। অস্ট্রিক ভাষাভাষীরা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেন।

বাংলায় কথা বললেও এঁদের দেবদেবী ও ধর্মকর্মের সাথে সমতল বাংলার আর্যভাষী ও আর্যরক্তমিশ্রিত বাঙালিদের দেবদেবী ধর্মকর্মের মিল নেই। এঁদের আরাধ্য দেব-দেবী হলো গ্রামদেবতি-দুয়ারসিনি-কুদরাসিনি-মনসা-চণ্ডী-জিতা-ধরম-করম-সাতবাহন, যাদের কোনো মন্দির নেই, আবাস হচ্ছে নদীতীরে, গাছতলায় বা পাহাড়ের পাদদেশে বা গ্রামের সীমান্তে। এঁদের পুজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়না, দেয়াসী (<দেবাংশী) বা পড়িত (<পণ্ডিত)-রাই এঁদের পূজক; যাঁদের সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করা একদা নিষিদ্ধ ছিল। একারণে, সীমান্ত বাংলার এই বিশাল সংখ্যক জনগণ আর্যবংশোদ্ভূত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে এবং এ নিয়ে গবেষণা চলছে। আর্যভাষী জনগোষ্ঠী তো একদা এই অঞ্চলের মানুষকে বলতো ব্রাত্য, এখানে পদার্পণ করলে আর্যভাষীরা প্রায়শ্চিত্ত করতো। অথচ কোনো এক সময়ে মাগধী অপভ্রংশজাত বাংলা ভাষা এই অঞ্চলে অবলীলাক্রমে প্রবেশলাভ করেছে। তাই এ অঞ্চলের লোকগান ঝুমুর-ভাদু-টুসু রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়।

সীমান্তরাঢ়ের রাজপরিবার

এই ভূমিরাজ্যগুলিতে যাঁরা রাজত্ব করতেন, তাঁরা আর্যভাষী ক্ষত্রিয় ছিলেন না। বেশির ভাগ রাজাই ছিলেন ভূইঞা। শের শাহ্-এর রাজত্বকালেরও বহু আগে থেকে এঁরা এই অঞ্চলে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করে আসছেন। রাজত্ব ছোটো, রাজা আরো ছোটো, তিনি ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য পরিদর্শন করতেন, এটাই তাঁর রাজকীয় স্টাইল। অনেকের রাজবাড়ি ছিল মাটির দেওয়ালের। মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বড়জোর খাপরার ছাউনি। যখন এই অঞ্চলে আর্যভাষীদের বসবাস শুরু হলো তখন এই সমস্ত রাজপরিবার নিজেদের বংশের ইতিহাসের সাথে একটি করে লৌকিক কাহিনি জুড়ে দিয়ে নিজেদের ওপর ক্ষত্রিয়ত্ব আরোপ করলেন এবং রাজপুত ক্ষত্রিয়দের মতোই নামের শেষে সিংহ, সিংদেব, রায়, সিংহরায় ইত্যাদি উপাধি যোগ করলেন। বড়ো বড়ো রাজারা ছাড়াও ছোটো ছোটো রাজারাও নিজেদের ভূঞা-ভূমিজ বা কুড়মি মাহাতো বলে পরিচয় না দিয়ে ক্ষত্রিয় রাজা বলেই পরিচিত হলেন। এই সমস্ত রাজাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পাঠান বা মোগল শাসকগণ সাহস করেননি, বাংলায় যখন নবাবি আমল চলছিল, তখনও এঁরা স্বাধীন ছিলেন। ১৭৫৭ সালের জুন মাসে পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় নবাবের সৈন্যদলকে পরাজিত করে ব্রিটিশ সিংহ ভেবেছিল যে এই দেশের মানুষকে সহজেই পদানত করা যাবে। কিন্তু অচিরেই তাদের ভুল ভাঙলো। ব্রিটিশ রাজশক্তি যাদের বলতো বর্বর, চুয়াড় তাদের বশীভূত করতেই বেগ পেতে হলো বেশি এই ব্রিটিশ সিংহের। ১৭৬৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ সিংহ একদিনও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেনি এই দেশ শাসন করতে এসে। ধলভূমের বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, অবশেষে ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশদের উত্যক্ত করে রেখেছিল।

এই সব মানুষদের সাথে অস্ট্রিকভাষী সাঁওতাল মুণ্ডা ওঁরাওদের কোনো বিরোধ ছিল না, যদিও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন। এই অঞ্চলের রাজাদের যখন রাজত্ব ছিল, তখন রাজদরবারও ছিল, আর রাজ দরবার যখন ছিল, তখন দরবারে নৃত্যগীতেরও প্রচলন ছিল। আর এই নৃত্যগীতের মধ্যে যা সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল এবং আজো আছে তা হলো ঝুমুর গান ও নাচ। যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা বলা হলো, সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমন কোনো জেলা নেই, যেখানে ঝুমুরের প্রচলন

নেই। এখানের সব গানই ঝুমুর গান, বলেছেন অধ্যাপক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। করম পরবে যে গান গাওয়া হয়, ছৌ নাচের সাথে যে গান গাওয়া হয়, আবার ডাঙালে-ডহরে-টাঁড়ে-টিকড়ে-বনে-বাদাড়ে মোষ চরিয়ে রাখাল কাঠকুড়ুনি কিশোরীকে বা পাতা তোলা যুবতীকে দেখে কাঠুরে যুবক যে গান গেয়ে মনের কথা নিবেদন করে এবং কিশোরী বা যুবতী যে উত্তর দেয় সে গানও ঝুমুর। এখানকার পল্লীপ্রকৃতি যেমন উদার, আকাশ যেমন উন্মুখ, ডুংরির জলে স্নান করার সময় যুবতীরা যেমন বসনভূষণের কোনো শালীনতা রাখেনা, তেমনি এখানকার ভাষাও সমতলের নাগরিক সমাজে অশ্লীল। তাই অনেকে ঝুমুর গানকে অশ্লীল বলে মনে করেন। স্নান করতে করতে যখন কোনো নারী গেয়ে ওঠে, 'সিন্যাতে সিন্যাতে তোহর বেনিয়া উজার / টিকুরী আঁচর গেল ছতিয়া সামার' (স্নান করতে করতে তোর চুল খুলে গেল, তোর আঁচল খুলে গেল কাঁচুলি খুলে গেল, এবার তোর বুক সামলা) তখন তাকে অশ্লীল বলা হয়, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গানে যখন 'বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া দিল রে' গাওয়া হয় কলেজ সোস্যাল-এ অডিটোরিয়ামে তখন তাকে কেউ অশ্লীল বলে না। আসলে, ঝুমুর গান কখনোই অশ্লীল নয়। যদি একে অশ্লীল বলতে হয়, তাহলে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সব কিছুই অশ্লীল।

দরবারি ঝুমুর

সীমান্ত বাংলার রাজদরবারে যে ঝুমুর গানের চর্চা হতো যাকে স্থানীয় মানুষেরা দরবারি ঝুমুর বলতেন, সেই ঝুমুরের সাথে ডাঙ্গাল্যা ডহরুয়া যে-সব লৌকিক ঝুমুর প্রচলিত, সে ঝুমুরের কিছুটা পার্থক্য আছে। অধুনা যে-সব শিল্পীরা ঝুমুর নাম দিয়ে যে-সব গান অ্যালবামে রেকর্ড করছেন বা গ্রুমিং করে উদীয়মান লোকশিল্পীদের দিয়ে টিভি চ্যানেলের রিয়্যালিটি শো-তে মেন্টর যা গাওয়াচ্ছেন, সে-সব ঝুমুর কোনোদিন দরবারে গাওয়া হতো না। দরবারে যে সব ঝুমুর গাওয়া হতো তার উৎস অন্যখানে।

ঝুমুর গাওয়া হয় যে অঞ্চলে তার ভৌগোলিক বিস্তৃতির সাথে অন্য কোনো গানের আঞ্চলিক বিস্তৃতির তুলনা হয় না। ঝুমুর অঞ্চলের বিস্তৃতি যেমন বিশাল, সুর ও তালের বৈচিত্র্যও তেমনি ব্যাপক। জামতাড়া আর কাশীপুরের দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু জামতাড়ার রাজসভার ঝুমুরের সুর, মাদলের বাদনশৈলী পরিবেশন পুরুলিয়ার কাশীপুরের রাজসভার ঝুমুরের সুর ও বাদনশৈলী থেকে পৃথক। অথচ উভয়েই হয়তো একই পদকর্তার রচিত ঝুমুর গাইছেন। দরবারে যে ঝুমুর গাওয়া হতো, তার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে গবেষকগণ চৈতন্যোত্তর যুগের কবি গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর রচিত সংগীতবিষয়ক গ্রন্থে ঝুমুর গানের সংজ্ঞা আবিষ্কার করেছেন। এ এক স্বতন্ত্র ধরনের সংগীত—অর্থাৎ ঝুমুর শুধু নাচ নয়, ঝুমুর কোনো সুর নয়, ঝুমুর হচ্ছে পরিপূর্ণ সংগীত এবং ঝুমুর আগে না কীর্তন আগে, ঝুমুরের দ্বারা কীর্তন প্রভাবিত, না ঝুমুরে কীর্তনের প্রভাব আছে, তা নিয়ে এখনো সংশয়ের অবসান ঘটে নি। তবে শ্রীচৈতন্য 'ঝারিখণ্ড'-এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণভারত গিয়েছিলেন বলে এখানকার সংগীতে বৈষ্ণবপ্রভাব এবং রাধাকৃষ্ণবাদের প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। আবার, কৃষ্ণধামালি নামে এক ধরনের গান এ অঞ্চলে প্রচলিত থাকায়, এ অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাত্মক গানের প্রচলন ছিলনা চৈতন্যের পুরী ভ্রমণের পূর্বে, একথাও বলা যায় না। তবে, চৈতন্য-প্রভাবে রাধা কৃষ্ণের প্রেম যেমন স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হয়েছিল, বৈষ্ণব কবিরা লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকাকে ভক্ত ভগবানে উন্নীত করেছিলেন, ঝুমুর পদকর্তারা কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেমকে লৌকিক প্রেমে রূপান্তরিত করেছিলেন। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, ননীচুরি থেকে শুরু করে চিকন গোয়ালিনী রাধার প্রণয় তাঁরা ঘরে ঘরে লক্ষ করেছেন। রাজদরবারে এই গানই গাওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই নাচনি সহযোগে। নবাব যেমন তাঁদের দরবারে বাঈজিদের দিয়ে নাচ করাতেন, ভূমিরাজ্যগুলির রাজারাও তেমনি রাজদরবারে যেমন সভাগায়ক নিযুক্ত করতেন তেমনি একজন নর্তকীও রাখতেন।

দরবারি ঝুমুরকে লোকসংগীত বলা যায় কিনা

দরবারি ঝুমুরকে লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা চলে কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন আসতেই পারে। বিশিষ্ট লোকসংগীত গবেষক হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঝুমুর পদকর্তা ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝুমুর গানকে লোকসংগীত বলে মানতে নারাজ। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেই বলি, ভবপ্রীতানন্দের গান যদি নাগরিক সংগীত হতো, তা হলে মানভূম-সাঁওতাল পরগণার পথে প্রান্তরে মাঠে ময়দানে মেলায় উৎসবে গীত হতো না, বা নাচনি ও রসিকরা তাঁকে গুরু বলে মানতেন না। দরবারি ঝুমুর দরবারের জিনিস, তা লোকসাধারণের সম্পত্তি বলবো কেন, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। উত্তর হচ্ছে, সংগীতের ভাষা বা তার পরিবেশনস্থল যাই হোক না কেন, তার মধ্যে যদি লোকায়ত সুর বা ভাব থেকে থাকে তাহলে তাকে লোকসংগীত বলতে আপত্তি কোথায়? আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষা তৎসম শব্দবহুল হলেও তার ভাব ও আবেদন সম্পূর্ণ লৌকিক, এবং রাজসভায় গীত হলেও সভাগায়ক বা নাচনি বা শ্রোতা সকলেই কিন্তু সাধারণ মানুষ। অনেক সময় স্বয়ং রাজাও গান বাঁধেন, কাঁধে মাদল নিয়ে, অথবা ধামসার কাঠি নিয়ে গান করেন, নাচনির সাথে আভিজাত্য ভুলে গিয়ে নাচেন। তাই দরবারি ঝুমুর অবশ্যই লোকসংগীত। কয়েকজন বিদগ্ধ পদকর্তা ছাড়া অধিকাংশ পদকর্তাই তাঁদের গানে লৌকিক শব্দ শুধু না, লৌকিক উপমারও প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৈঠকি ঝুমুরের সাথে পদাবলী ঝুমুরের সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বৈঠকি ঝুমুরের স্বতন্ত্র কোনো পদ নেই, দরবারি ঝুমুরের পদকর্তাদের রচিত পদগুলিই গাওয়া হয়, তবে এ গানে নাচের কোনো ভূমিকা নেই, মাদলিয়াকে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে মাদল বাজাতে হয়না, বৈঠকি ঝুমুরের গায়ন পদ্ধতিও আলাদা। রাজদরবার ছাড়াও মানভূমের অনেক ধনী জমিদার বাড়িতে বৈঠকি ঝুমুরের আসর বসাত। উল্লেখ্য যে সাঁওতালসমাজের নৃত্যগীতে এবং ঝুমুর গানে প্রায় একই বাদ্যযন্ত্র, যথা মাদল ধামসা বাঁশি ব্যবহৃত হয় বলে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছিলেন ঝুমুর গান সাঁওতালি গানের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর এই মত মেনে নিয়ে কাজী নজরুলের কয়েকটি সাঁওতাল জীবন সম্পৃক্ত গানকে লোকে ঝুমুর গান মনে করেন। আবার তার কোরিওগ্রাফি করার সময় সাঁওতালি নাচের কোরিওগ্রাফি করে ঘোরতর অজ্ঞতার পরিচয় দেন। তাঁরা কি জানেন না যে ঝুমুর নৃত্য একক নৃত্য এবং সাঁওতালি নৃত্য যৌথ নৃত্য? তাছাড়া সাঁওতালি গানে যে মাদল ব্যবহৃত হয়, ঝুমুর গানের মাদলের আকৃতি তা থেকে আলাদা। সাঁওতালি গানে নাচ অপরিহার্য, ঝুমুর গানে নাচ অপরিহার্য নয়। শুধু নাচের জন্য নাচনিশালিয়া ঝুমুর নামেও এক ধরনের ঝুমুর প্রচলিত আছে।

পদকর্তারা দু-ধরনের ঝুমুর রচনা করেছেন—ছুট ঝুমুর আর পালাবন্দি ঝুমুর। ছুট ঝুমুরের অধিকাংশ পদ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, কিছু চর্যাপদের মতো রূপকাশ্রয়ী হেঁয়ালিপূর্ণ নির্গুণ ঝুমুরেরও প্রচলন

আছে। পালাবন্দি ঝুমুরের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের লীলা ছাড়াও ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। একারণে, দুর্জয় মান, কলঙ্ক ভঞ্জন, রাস, কালীকৃষ্ণ, সুবলমিলন ইত্যাদি পালা ছাড়াও বিভিন্ন পদকর্তা রচিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' 'সীতাহরণ', 'বালীবধ', 'লবকুশ', 'কীচকবধ' 'সুভদ্রাহরণ', 'অভিমন্যুবধ', 'অর্জুনের লক্ষ্যভেদ' ইত্যাদি অজস্র ঝুমুর পালা রাজদরবারে এবং লোকালয়ে ঝুমুর গানের আসরে পরিবেশিত হতো। পালা ঝুমুরেও নাচনিরা অংশগ্রহণ করতেন। পুরুলিয়ার পাতকুন পরগণার কানাই সিং নামে এক ঝুমুর মহাজনের বাড়িতে ঝুমুর গবেষণার আদিপুরুষ পুরুলিয়ার প্রথম স্নাতক ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচ-ছ'খানি ঝুমুরের চপ্‌তা (পুথি) আবিষ্কার করেছেন। এই চপ্‌তাগুলিতে একাধিক পদকর্তা-রচিত একাধিক পালা ঝুমুর সংকলিত আছে। ঝুমুর নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁরা যদি পুরুলিয়ার এই প্রত্যন্তে গিয়ে এই চপ্‌তাগুলি থেকে ঝুমুর পদ সংগ্রহ করেন এবং চপ্‌তাগুলি নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে নিজেরাও সমৃদ্ধ হবেন, ঝুমুর সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা স্বঘোষিত ঝুমুরিয়া হয়েছেন তাঁদের ভুলটাও ভেঙে দিতে পারবেন। দুঃখের বিষয়, পালা ঝুমুর বিষয়টি নিয়ে অনেকেরই এখনো অজ্ঞতা থেকে গিয়েছে। পাশাপাশি, সুখের বিষয় এই যে লেখকের কাছে এ-ও খবর আছে যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একজন ছাত্রছাত্রী কলকাতার হস্টেলে থেকে নয়, সরাসরি পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগণার প্রত্যন্তে গিয়ে ঝুমুর শিল্পীদের দাওয়ায় বসে তাঁদের গৃহিনীর হাতের রান্না খেয়ে তাঁদের দস্তুরমতো দক্ষিণা দিয়ে পদধূলি নিয়ে দরবারি ঝুমুর সংগ্রহ করছেন—এধরনের ঘটনার সাক্ষী থাকার সুযোগ মধ্যে মধ্যে লেখকের হয়ে থাকে। এখনো দরবারি ঝুমুরের আসরে বসে, উৎসাহীরা ঝুমুর সম্মেলনের আয়োজন করেন, নাচনিরা এসে নাচও করে যান। দরবারি ঝুমুরের যাতে ব্যাপক প্রচার হয়, তারও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই সব তরুণ-তরুণীরা। কিন্তু পালা ঝুমুর অবলুপ্তির মুখে। সেক্ষেত্রেও এই সব গবেষকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। দরবারি ঝুমুর, পালা ঝুমুর বা ছুট ঝুমুর যাঁরা রচনা করে গেছেন, ঝুমুরশিল্পীরা তাঁদের মহাজন বলে থাকেন। বাস্তবিকই, এই সব পদকর্তাদের প্রতিভা অনেক সময় বৈষ্ণব পদকর্তাদের সমকক্ষ। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মানভূমের ঝুমুর' গ্রন্থে ছিয়াত্তর জন পদকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে এই তালিকা অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ শতাধিক মহাজন রাজমহল থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে বর্তমান ছিলেন যাঁরা প্রত্যেকেই শতাধিক, কেউ কেউ সমস্রাধিক পদ রচনা করে গেছেন। সে সমস্ত গান এখনো ঝুমুরের আসরে শোনা যায়। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

চামু রাণা (কর্মকার)

বিহারি কর্মকারের উপাধি হল রাণা। চামু তাঁর ভণিতায় রাণা উপাধিটি ব্যবহার করতেন। চামুর জন্ম সাঁওতাল পরগণায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের আগে পরে কোনো এক সময়। তাঁর একাধিক নাচনি ছিল। জামতাড়ার রাজসভায় তিনি গান গাইতেন, কিন্তু কোনো রাজসভাতে তিনি বাঁধা থাকতেন না। উনিশ শতকের শেষের দিকে তিনি পশ্চিম বর্ধমানের অলিগঞ্জ মৌজার মীর্জাপুরের হুচুকপাড়ায় অলিগঞ্জ গ্রামের দয়াল দাসের জমিতে আশ্রয় পেয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামত করতেন এবং কথায় কথায় ঝুমুর বাঁধতেন। তাঁর সহস্রাধিক পদ এবং দশ-বারোটি ঝুমুর পালা সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বর্ধমান এবং মানভূমের এক ব্যাপক অংশে জনপ্রিয় ছিল। তাঁর একাধিক নাচনি থাকায়, অনেক কর্মকার উপাধিধারী ব্যক্তি নিজেকে চামুর উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, পৌত্র দিগম্বরও ঝুমুর বাঁধতেন। স্থানীয় প্রফুল্লকুমার সিংহ, সুকুমার রায়, পবিত্র ভট্টাচার্য প্রমুখের উৎসাহে প্রতি বছর মীর্জাপুরে ঝুমুর সম্মেলন হতো বামফ্রন্টের আমলে, বর্তমানে বন্ধ আছে। চামু-রচিত পালাগুলির নাম 'সীতাহরণ', বালীবধ', 'লবকুশ' ইত্যাদি। অলিগঞ্জ মৌজার দয়াল দাসের পৌত্র নিত্যানন্দ চামুর ঝুমুরে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজে ধ্রুপদ-ধামার ও খেয়াল গানের শিল্পী হয়েও এবং ফিল্মে ও নাটকে আধুনিক গান লিখে থাকলেও বেশ কয়েকটি ঝুমুর গান ও পালা রচনা করেন। পঞ্চকোটে অনুষ্ঠিত ঝুমুর সম্মেলনে তিনি 'ঝুমুর বিশারদ' উপাধি পান। হিজ মাস্টার্স ভয়েস, টুইন, রিগ্যাল, মেগাফোন থেকে তাঁর লেখা ঝুমুর নিজের কণ্ঠে এবং জ্ঞানপ্রিয়া বৈষ্ণবী, রেবা সোম প্রমুখের কণ্ঠে গীত হয়। 'ব্রজের কানাইয়া জাদুকর' এবং 'রূপে মায়ের ত্রিভুবন আলা' গান দুটিই প্রথম দরবারি ঝুমুরের রেকর্ড হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে প্রকাশিত ও নিত্যানন্দ দাস কর্তৃক রচিত ও গীত। প্রথমোক্ত গানটি ২০১৬ সালে শিল্পী দেবলীনা সিংহরায় সা রে গা মা-র 'শুনেন বাবু হে' অ্যালবামে গেয়েছেন।

চামু রাণা রচিত একটি পদের নমুনা :

কুযোগে জন্ম নিলা, ছেল্যা জানে হাজার কলা
ছেল্যা করে খেলা দিয়ে হামাগুড়ি গো
এঁঠো করে দিলেক সরের হাঁড়ি ।। রং।।
ছেল্যাট ঠগের গোড়া ক্ষণেক সেজে থাকে বুঢ়া
(ও সে) পাড়ায় পাড়ায় করে তাড়াতাড়ি ।। রং।।
একদিন ভাদর মাসে রেখেছিলম তাল ঘস্যে
(ও সে) হেসে হেসে খেয়ে গেল মাড়ি গো।। রং।।
একদিন মরেছিল জ্বরে দেয় নাই ক্যানে খাল খঞ্জরে
দেখে শুনে এলো যমের বাড়ি গো।। রং।।
ভক্তিভাজন চামু বলে ধরতে নারি এমন ছেলে
(তার) হাতে পায়ে দিয়ে রাখি বেড়ি গো।। রং।।

(গানটি নিত্যানন্দ দাস প্রথমে টুইন রেকর্ডের স্যাম্পলে রেকর্ড করেছিলেন, পরে রেকর্ড হয়েছিল কিনা জানিনা। সাতের দশকে নিখিল চক্রবর্তী গৌড়ীয় গীতি সংস্থা এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক গানটি রেডিওতে প্রচার করেন। সম্প্রতি স্বর্ণালী রায় নামে এক নবীন শিল্পী 'শিকড়ের টানে' অ্যালবামে গানটি গেয়েছেন।)

চামু বাংলা ছাড়াও কামাচিয়া বাংলা, মৈথিলি ও সাঁওতালি ভাষায় ঝুমুর রচনা করেন। চামু নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর ঝুমুর লিখিত আকারে বেশি পাওয়া যায় না।

ভববপ্রীতানন্দ ওঝা

সাঁওতাল পরগণায় চামু ও ভবপ্রীতানন্দ ওঝাকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে যেমন তুলনা করা হয়, তেমনি তুলনা করা হয়ে থাকে। চামুর রচনা সহজতর বলে চামু হয়তো সাধারণ শ্রোতার কাছে জনপ্রিয়, কিন্তু সহজ হলেও কাব্যমূল্যে কোনো অংশে ন্যূন নয়। ভবপ্রীতার পদে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য, অলঙ্কারের ঝঙ্কার এবং গায়নশৈলীতে ভারতীয় রাগসংগীতের প্রভাব থাকায় ভবপ্রীতার পদ বিদগ্ধ সমাজে সমধিক আদৃত। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম এবং বৃহত্তর ঝুমুর-প্রভাবিত অঞ্চলে ভবপ্রীতাই সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ভবপ্রীতার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ যন্ত্রমণি ওঝা মিথিলার বিল্বপঞ্চক গ্রাম থেকে সাঁওতাল পরগণার দেওঘরের বৈদ্যনাথধামে প্রধান

পুরোহিত হিসাবে যোগ দেন। 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী' গ্রন্থে তাঁর চতুর্দশ পুরুষের নাম দেওয়া আছে। তাঁর যে ফটো দেওয়া আছে, তার নীচে তাঁর পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে : 'শ্রীশ্রী বৈদ্যনাথ চরণ পরায়ণ মহান্ত সদুপাধ্যায় শ্রী ভবপ্রীতানন্দ ওঝা মালিক মঠ ও গৈরহা।' ভবপ্রীতা-রচিত ঝুমুর গান তৎসম শব্দবহুল, কিছু গান মৈথিল ভাষায়, কিছু হিন্দিতে এবং স্থানীয় মাগধী ভাষাতেও রচিত। তাঁর রচিত সংগীত 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী'-তে সঙ্কলিত করে তা প্রকাশ করেন শিরোমণি হাজরা মহাশয়। বর্তমানে এ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। প্রয়াত ঝুমুর গবেষক পবিত্র ভট্টাচার্য এই পুস্তকটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। ভবপ্রীতানন্দ সাঁওতাল পরগণায় মানুষ হলেও মানভূমে অধিক জনপ্রিয় ছিলেন, কারণ তিনি পঞ্চকোট রাজ বিদ্যাপতি প্রসাদ সিংদেও-র সভাগায়ক ছিলেন। প্রচুর ছুট ঝুমুর ছাড়াও তিনি 'জলসম্বাদ পালা', 'অভিমন্যু বধ', 'শ্রীরাধার বাসরসজ্জা', 'দুর্জয় মান', 'কুন্তী গান্ধারীর কোন্দল' ইত্যাদি পালা রচনা করে গেছেন। তাঁর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালায় 'উঠ উঠ বীর, ধর ধনুতীর, দশশির বধিবারে' গানটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। হিন্দি ভাষায় রচিত 'কৌন হো তুম্, নেহি কুছ্ মালুম, কাহে কো অন্দর আতে হো' গানটি সম্ভবত গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়েছিল, তবে ঝুমুরের আঙ্গিকে নয়। কিন্তু অনেকেই এটিকে ঝুমুর আখ্যা দিতে আপত্তি করেন না। ভবপ্রীতার কাব্যগুণসমৃদ্ধ অজস্র পদ থেকে একটি পদ নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করা গেল :

শারদ পূর্ণিমা নিশি পূর্বাশায় পূর্ণশশী
নিজে হাসে হাসায় অবণী
মৃদু কুহরে কোকিল বহিছে সুগন্ধানিল
সৌন্দর্যেতে বিবশা রজনী।
স্বচ্ছ সরোবর মাঝে পূর্ণবিধুবিম্ব রাজে
সাজে কত কুমুদ কল্হার
হারাইয়া দিনমণি যেন প্রোষিতা রমণী
নলিনীর মলিন আকার
প্রস্ফুটিত নানা ফুল ঝঙ্কারিয়া অলিকুল
আকুল মানসে মধু খায়
এ ফল ত্যজি আর অন্য ফুলে মতিয়ার
লম্পটেরে শৃঙ্গার জানায়।
মঞ্জুকুঞ্জে রাখি কর হেরি শোভা মনোহর
হরণ করিতে গোপীমন
মাতিয়া মদন রসে ধ্বনিল বংশী সরসে
শুনি রাধার উচাটিত মন।

দিবা অবসানে নিকুঞ্জ কাননে কে রাজায় মোহন বাঁশি রে (বাঁশি) রাধানাম ধরে ডাকে উচ্চৈস্বরে আকুল প্রেম প্রকাশি রে

।। কাননে বাজত বাঁশি
বাঁশি ব্রজবধূ কুল নাশীরে।। রং
শুনি সে বাঁশরী বাঁচে কি নাগরী নাগরে না ভালোবাসি রে।
হেন লয় মনে গিয়ে কুঞ্জবনে পরি গে প্রেমের ফাঁসি রে।।
।। কাননে বাজত বাঁশি।। রং।।
গৃহে ননদিনী যেন ভুজঙ্গিনী শাশুড়ি গরল রাশি রে
মিলিতে মাধবে বাধা দেয় সবে ভবপ্রীতা কহে প্রেমে ভাসি রে
।। কাননে বাজত বাঁশি।। রং।।

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা গত শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সম্ভবত ইনিই মহাজনদের মধ্যে বয়সে নবীন ছিলেন।

দীনবন্ধু তন্তুবায় (দীনা তাঁতি)

দীনবন্ধু তন্তুবায় দীনা তাঁতি নামেই ভক্তদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন, যেমন কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে সকলে কানাকেষ্ট বলেই অভিহিত করতেন। এগুলি জনপ্রিয়তার লক্ষণ। চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত পাতকুম পরগণার সিরুম গ্রামে এক তন্তুবায় পরিবারে তাঁর জন্ম। বংশগত পেশা বস্ত্র বয়নের পাশে ইনি ঝুমুর পদ রচনা করতেন। তাঁর প্রথাগত শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত, কিন্তু তিনি পুরাণাদি পাঠ করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ঝুমুর গায়কগণ দীনা তাঁতিকে চামু-ভবপ্রীতার মতই উচ্চে স্থান দিয়ে থাকেন। নির্গুণ ও পৌরাণিক উভয় প্রকার ঝুমুর রচনাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল। রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদে তিনি বৈষ্ণবকবিদের অনুসরণ বা অনুকরণ করেননি। তাঁর রচনায় মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর কবিপ্রতিভা লক্ষ করার মতো। যেমন,

বৃন্দাবনে ফুটি গেল নানা জাতি ফুল হে
মধুলোভে উড়ে ভমরাকুল হে—ধ্রুঃ।।
ফুলে ঝবরল ডাল ধাদকি শিমুল হে।
ফুটি গেল কত পলাশ পারুল হে।। রং।।
কমল চম্পক বক, বাঁধুলী, বকুল হে
গন্ধে আমোদিত যমুনা দুকূল হে।। রং।।
কি কর রসের নিশি রসে সমতুল হে
তরুমূলে দীনা নাগর বাউল হে।। রং।।

কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেকগুলি পালা রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'অভিসার', 'মিলন', 'রাসলীলা', 'বিরহ' ইত্যাদি পালায় বহু উচ্চাঙ্গের পদ লক্ষ করা যায়। বর্ষাবিরহের একটি পদের নমুনা :

বরিষাকে ঋতুয়া নিবিড় বাদরিয়া
দরপি দরপি উঠে ছাড়িয়া
নাহিরে আওত কালিয়া।। রং।।
* * * *
দীনাকে টুটল আশ বিগত আষাঢ় মাসে
প্রথম শাওন ভেল সখিয়া।। রং।।

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পালা ছাড়াও মহাভারতের 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' পালাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী

পাতকুম পরগণার বিড্ডি গ্রামের রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ছিলেন একজন বিখ্যাত পদকর্তা। উচ্চশিক্ষিত এবং ধ্রুপদ ধামারের শিল্পী প্রথম জীবনে ঝুমুরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তাঁদের আদি নিবাস ছিল লিছুপুরের কাছে বেলাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ বিড্ডি গ্রামে বসবাস করবেন। তিনি ছিলেন একজন ছোটোখাট জমিদার। রামকৃষ্ণ ইছাগড়ের রাজার সভাগায়ক ছিলেন। ইছাগড়ের জমিদার-কুমারের জন্মের একুশ দিনের অনুষ্ঠানে শ্রোতারা উপস্থিত না থেকে গ্রামের একটি ঝুমুর গানের আসরে উপস্থিত থাকায় রামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে ঝুমুর গানের মাধুর্য উপলব্ধি করেন এবং নিজে ঝুমুর গান শিখতে শুরু করেন। কালক্রমে তিনি ঝুমুর গানের কবি, শিল্পী, বাদক নর্তক এবং শিক্ষক পরিণত হন। মানভূমে এমন কোনো আসর ছিল না যেখানে রামকৃষ্ণের গান গাওয়া হতো না। তাঁর অজস্র পদের মধ্যে একটি নমুনা—

রসের সাগর মাঝে প্রেমকমল বিরাজে
পরিমল দিগন্তে যাহার
আছে মধু শান্তি তায় অন্যে কি জানবে হায়
সাধু অলি মর্ম জানে তার
ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী তাইতো তাহারে চায়গো

সে রসে বিরস মণ্ডুকে কি হায় নিকটে থাকি না পায়গো
ঐছন প্রেম গূঢ় মরম সকলে জানে কি তায় গো।। রং।।
বিধু অগ্নি ক্ষণপ্রভা পাইয়ে তাহার আভা, কুমুদিনী কভুনা প্রকাশে,
হইলে ভানুর উদয়, যত্ন না করিতে হয়, মনোসুখে আপনি বিকশে
ভেদি ভ্রম অন্ধকার শুদ্ধ জ্ঞান আছে যাহার
বিরাজে বিকশে প্রেম তার সনে গো, তার মনে
তা নইলে কি প্রেম সখি জনমে সাধারণে।। রং।।
উচ্চনীচ অভিমান মান জাতি ভেদজ্ঞান কিম্বা দুখী কিম্বা ধনবান
প্রেমেতে নাহি বিচার অন্যে কি কহিব আর
চণ্ডালেরে কোল দিলেন রাম।
ত্যজিয়া অমূল্যরতন নানা উপহারগণ যদুপতি প্রেমের কারণ
আপনি বিদুর গৃহে হরি করিলেন ভোজন,
শান্ত ছিল তার মন।। রং।।
এহেন কৃষ্ণের প্রেম যেন নিকষিত হেম যার অন্ত অনন্ত না পায়,
এহেন অমূল্য নিধি ভাবে যারে নিরবধি নারদ বৈরাগ্য নিল যার
এহেন প্রেমেতে না জন্মিল রতি ধিকধিক রামকৃষ্ণের মতি
দুর্গতি তার ঘুচিল না হায়।।
বিষম বিষয় মদেতে মাতি এ দুর্লভ জনম বিফলে যায়
কিঞ্চিৎ করুণা করো আমায় ডাকি হে প্রেমময় তোমায়।।

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে পুরাণের উদাহরণ ঝুমুর পদটিকে একটি উচ্চ শ্রেণির কবিতায় পরিণত করেছে। পদটিতে কবির যে বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে তা যে-কোনো অঞ্চলের লোকসংগীতে সুলভ নয়। তিনি মনে করতেন, ঝুমুর গানকে কাব্যগুণসমৃদ্ধ এবং সেই সঙ্গে রাগাশ্রয়ী সুরে সুরভিত না করলে বিদ্বজ্জন সমাজে এবং দরবারে ঝুমুর সমাদৃত হবে না। এ কারণে, তাঁর সমস্ত পদেই তাঁর পাণ্ডিত্যের ও ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ জীবনে নাচনি ও ঝুমুরের পেছনে অর্থব্যয় করে তাঁর আর্থিক দুর্দশা ঘটে এবং বার্ধক্যজনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

জগৎ কবিরাজ

রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ছিলেন জগৎ কবিরাজ। যদিও তাঁর কণ্ঠস্বর রামকৃষ্ণর মত মধুর ছিল না, কারণ রামকৃষ্ণ কণ্ঠসাধনার দ্বারা নিজের কণ্ঠকে সমৃদ্ধ করে উচ্চাঙ্গ সংগীত গাইতেন। জগৎ কবিরাজের সে কণ্ঠস্বর ছিল না। কিন্তু তিনি গানে এমন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন যে তাঁর গানের কথা ও সুরে শ্রোতারা সকলেই আকৃষ্ট হতো। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর মতো ইনিও একজন দস্তুরমতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বংশানুক্রমিক পেশা কবিরাজি এবং উপাধি সেনগুপ্ত হলেও তিনি লোকসাধারণের কাছে জগৎ কবিরাজ নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাস ছিল মানবাজারের কাছে পলাশি গ্রামে। দুঃখের বিষয়, তাঁর ঝুমুরগুলি গ্রন্থিত হয়নি। শ্রীমদ্ভাগবত সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেও তিনি স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দপ্রয়োগে কুণ্ঠিত ছিলেন না। ফলে, তাঁর গান সাধারণের বোধগম্য হতে কোনো বাধা ছিল না। নমুনাস্বরূপ তাঁর রচিত একটি ভাদরিয়া সুরের ঝুমুর উদ্ধৃত করা হল। এর পরিবেশনভঙ্গি দাঁড় ঝুমুরের স্টাইলে।

শ্রীরাধার উক্তি :
এখনো নাগর তোর ভাঙ্গে নাই ঘুমের ঘোর
পথ ভুলে এলি কি বিহানে!
ছি ছি বধূ লাজ নাই তোর কোনোখানে।। রং।।
কে তোরে করে সোহাগ, দিয়াছে রতির দাগ
পান খেয়ে লেগেছে বয়ানে।
প্রাণবঁধূ রে লাজ নাই তোর কোনোখানে।। রং।।
ঘুচাব তোর নাগরালি মুখে দিব চুণকালি
থাকিতে না দিব বৃন্দাবনে।
কে রাখে রাই-রাজার শাসনে?।। রং।।
* * * * *
জগৎ জুড়িয়া কর বলে, শুন হে নাগর
ধর ধর সখির চরণে।
প্রাণ বঁধূ হে, অনুগ না হলে পাবি কেনে?

অন্যান্য কবির মতো জগৎ কবিরাজ-ও 'জলসম্বাদ' এর মতো পালাবন্দি ঝুমুর রচনা করলেও ছুট ঝুমুর রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। তাঁর গানে শ্লেষ ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

দুর্যোধন

ঝুমুর পদকর্তাদের সম্পর্কে গবেষিকা দেবলীনার কাছে একটি প্রবাদ শুনলাম। প্রবাদটি পুরুলিয়ায় বহুল প্রচলিত। প্রবাদটি হল—''রামকৃষ্ণের গলা, দুর্যোধনের বলা, আজমতের চলা।'' রামকৃষ্ণের গলা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, ধ্রুপদ ধামার খেয়ালে যাঁর কণ্ঠসাধনা তাঁর কণ্ঠে মন্দ্র, মধ্য, তার তিনটি সপ্তকেই সুরগুলি যে পোষা পাখির মতো খেলা করবে এ আর বিচিত্র কী? দুর্যোধনের বলা অর্থে তাঁর গানের বাণীকে বোঝায়, আর আজমতের চলা বলতে বোঝায় আজমতের গায়ন শৈলীকে। দুর্যোধনের রচিত ঝুমুর পদের একটি নমুনা প্রদত্ত হল :

রমণী রমণী রমণীর মাঝে, ফুল মাঝে যেন নলিনী রাজে
ওই ভামিনী, গজগামিনী কার কামিনী, সখা
দেখিয়া মন ভুলিল, নিরখিয়ে মন মজিল আমার।। রং।।
বিকচ পঙ্কজ শ্রীমুখ শোভা তাহাতে কিঞ্চিৎ অরুণ-আভা
রসে টলমল রূপে ঝলমল ভাবে ঢুলুঢুলু সখা
হেরিয়ে মন ভুলিল, নিরখিয়া মন মজিল আমার।। রং।।
নবযৌবন নব আবেশে সঙ্গিনী সাথে হাস্য পরিহাসে
ভুরু ভঙ্গীতে আঁখি ইঙ্গিতে যায় রঞ্জিতে সখা
হেরিয়ে মন ভুলিল, নিরখিয়া মন মজিল, আমার।। রং।।
দুর্যোধনার ভাগ্যে কভু কি বিধি মিলাইবে হেন রতন নিধি
বুকে রাখিব দুখ নাশিব ভাবে ভাসিব সখা
হেরিয়ে মন ভুলিল, নিরখিয়ে মন মজিল।। রং।।

কানাই সিং

পুরুলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে বেগন-কোদর গ্রামের কানাই সিং একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষ বেগন সিং এবং জনৈক ঝালসিং পঞ্চকোট রাজের প্রহরী ছিলেন। তাঁদের কোনো এক সময় কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চকোটরাজ তাঁদের 'বেগন কোদর' এবং 'ঝালদা' নামক জমিদারি দুটি দান করেন। কানাই সিং-এর পূর্বপুরুষেরা আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে গোবরঘুসিতে এসে সেখানকার জমিদার বংশের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। কানাই সিং ছাড়াও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভিক্ষাম্বর ও বৃন্দাবন বিখ্যাত ঝুমুর পদকর্তা ছিলেন। কানাই সিং-এর বাড়িতে দস্তুরমতো একটি দপ্তর (লাইব্রেরি) ছিল এবং সেখানে বেশ কয়েকটি ঝুমুর গানের চপ্‌তা

(পুথি) রক্ষিত ছিল। সেগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। এই চপ্‌তাগুলিতে সংকলিত ঝুমুর পালাগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক 'চাঁদমাসা পালা'-টি অন্যতম। এর বিষয়বস্তু হল বালক শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার কাছে চাঁদ ধরে দেওয়ার জন্য বায়না করলে রোহিনীর উপদেশে কৃষ্ণকে রাধার কোলে বসিয়ে দেওয়া হল, যদি রাধার চাঁদমুখ দেখে শ্রীকৃষ্ণর কান্না থামে! কিমাশ্চর্যম্‌! রাধার মুখ দেখে শ্রীকৃষ্ণর কান্না থেমে যায়। এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে কানাই সিং বলেছেন :

রাধিকার কোলে কৃষ্ণ অতি মনোহর
সুমেরু শিখরে কি উড়িল জলধর।
* * * *
স্বর্ণলতা বেড়া নীলমণি ঝলমল
কাঞ্চন কমল কোলে শ্যামল কমল
মণি হারাইয়া ফণী পুনঃ যেন পায় মণি
শ্যামচাঁদ পাইয়ে তেমন
লয়ে মুখে বিধুমুখে হেরে রাই মনোসুখে
কানাইয়ার না মেলে চেতন।

উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডি উপভাষায় নামের শেষে 'আ' যোগ করে সম্বোধন করা হয়, যেমন কানাই > কানাইয়া, দুর্যোধন > দুর্যোধনা, দীননাথ > দীনা, গৌরাঙ্গ > গৌরাঙ্গিয়া, তা অনাদর অর্থে নয়, আদর অর্থে। কবিরাও এই নামে পরিচিত হতে ভালোবাসতেন। কানাই সিং-এর উল্লিখিত পদটি পাঠ করে উপমা প্রয়োগে কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

উপসংহার

স্থানাভাবে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটির রচয়িতা ঝুমুর পদকর্তা পীতাম্বর দাস এবং 'ফাঁকি দিয়ে পালালে আসাম' গানটির রচয়িতা বরজু দাসের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হল না। তাছাড়া এঁরা রাজদরবার অপেক্ষা জনতার দরবারে গান গাওয়াই পছন্দ করতেন। এছাড়া চৈতন সিং, শ্রীপতি দত্ত, হাড়িয়া কামার, যাদু রায়, ঘাসিরাম মাহাত প্রমুখ পদকর্তাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা গেল না। তবে, যে কয়জন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল তাতে আশা করি পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঝুমুর গান বাংলা লোকসংগীত হিসাবে কতটা সমৃদ্ধ এবং তার কাব্যগুণ যে কোনো বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত হতে বাধ্য। ঝুমুর গানের কবিরাও যে কতখানি কবিত্বশক্তি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী তা যদি বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে স্বঘোষিত ঝুমুরিয়ারা, যাঁরা গান লিখে তরুণ তরুণীদের কাছে বিক্রিবাটা করে দু পয়সা রোজগার করছেন, তাদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। সালাবত মাহাতো প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু এখনো পুরুলিয়া সাঁওতাল পরগণায় বহু ঝুমুরিয়া আছেন যাঁরা দরবারি ঝুমুরের ঐতিহ্য এখনো বহন করে চলেছেন।

তথ্যসূত্র

১. সীমান্ত বাঙলার লোকগান, ড. সুধীর করণ
২. মানভূমের ঝুমুর, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

With Best Compliments of

FRIENDS CONSTRUCTION

DURGAPUR, BURDWAN

Sl. No. 166

বিয়ের গানে বাস্তব ছবি

রত্না রশীদ

আসমুদ্র হিমাচল ভারত যখন নচ্ছারবাবা (রাম-রহিম)-এর কাণ্ডকারখানায় উত্তাল, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে পড়ে গেল, বহু বছর আগে সংগৃহীত বিয়ের গান ও কাপ্-এর কথা। কত কত বছর আগে নিরক্ষর বিয়ের গীত গাউনি মা-বোনেরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা, তিক্ত হলেও, স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের গান, নাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে। সমাজের সর্বস্তরের বাস্তব ছবি অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে, সততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই নারীরা বাস্তব লোকসংবাদিকের কাজ করে দিয়েছেন। আজকে যা খবরের কাগজে, টিভিতে দেখছি, বহু-বহু বছর আগে এই গীত-গাউনিরা সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন আমাদের। কিন্তু এঁদের কথায় কর্ণপাত করে কে? ইতিহাস নির্বিবাদে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েই চলে।

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার বিরুলি গ্রামের শেখ নমুনা এলাকার ডাকসাইটে বিয়ের গীত-গাউনি। সে সঙ্-কাপ্ও খুব দাপটের সঙ্গে করে। সমাজের, সংসারের, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রক্ষকদের দ্বারা অহরহ ঘটে চলা কাপট্যকে বিদ্ধ করাই এই কাপ্ বা সঙ্গুলির উদ্দেশ্য। ক্ষমতাবান পুরুষেরা যে-কাজ করতে ভয় পায়, পাঁচ-পা পিছিয়ে আসে, নমুনার মতো বীরাঙ্গনারা অবলীলায় সেখানে সুতীক্ষ্ণ তরবারি-চালিয়ে যুদ্ধ জয় করে নেয়।

১নং কাপ : বিয়ের গান গাইতে গাইতেই নমুনা ছোটো ছোটো ব্যঙ্গনাটিকা (কাপ্) পরিবেশন করে। এই কাপ্টির উপস্থাপনাকালে প্রস্তুতি হিসেবে নমুনা শাড়ির ওপরেই কোমর থেকে একটা লুঙ্গি পরে নেয়, ওপরে চাপায় একটা সাদা পাঞ্জাবি, আর একটা সাদা নামাজি টুপি মাথায় পরে নেয়। এরপর নিজের মাথার লম্বা চুল পেছন থেকে দুভাগ করে সামনে এনে চিবুকের ওপর গিঁট বেঁধে দিয়ে ঝুলন্ত দাড়ি তৈরি করে ফেললো মাত্র দেড় মিনিটে। তারপর শুরু করল কাপ্। প্রথমে সামান্য একটু প্রাথমিক কথন : ''জুয়ান জুয়ান মেয়েরা যেখন মৌল্বি সাহেবের কাছে আরবি পড়তি যায়, মৌল্বি দ্যাড় মিনিটে আর সব মেয়েকে ছেড়ি দিয়ি নিজের পছন্দের একটিকে একলা পড়াবার ছল করে, আর দাড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে আঙ্গুল ইশারায় কাছে ডাকে। বুড়ো মিন্সের ইশারা ছেলেমানুষ মেয়েটি বোঝে কি বোঝে না বুঝা যায় না। তখন খুল্লমখুল্লা আসরে লাফায় মৌলবি—

শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্ ইয়া রাব্বানা (ধুয়া)
আমি এমুন কায়দা শিখোয়ে দুবো, কুথাও পাবে না।।

শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্ ইয়া রাব্বানা
টিপে টাপে নিয়ে যাবো আমার বিছেনায়।।

শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্ ইয়া রাব্বানা
তুমার সেয়ার (পেটিকোট) ভিতর ঢুকে যাবো, আর বেরুবো না।।

শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্ ইয়া রাব্বানা
কোলজুড়া ছেলে আসবে বিয়ে লাগবে না।।

শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্ ইয়া রাব্বানা (দুবার)

রাম-রহিম কি আজ নতুন তৈরি হলো? অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মীয় মোহগ্রস্ত সমাজে এরা যে আবহমনকাল ধরে ধর্মের নামে নষ্টামি করে চলেছে, আধুনিক মিডিয়া সেটা আজ জানছে। মসজিদে কোথায় কী ঘটে চলেছে তা আমাদের গীত্গাউনি মা-বোনেরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। গ্রাম-গঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘটা ঘটনাও এই লোক-সাংবাদিক মহিলাকুলের নজর এড়ায় না। নিজেদের মতন করে প্রতিবাদটা তাঁরা রেখে গেছেন, কেউ তাতে কর্ণপাত করেনি, সে ভিন্ন কথা।

২নং কাপ্টির প্রেক্ষাপট এরকম : মৌলবি সাহেবদের গ্রামের মানুষ খুবই সম্মান করেন। ছোটোখাটো থেকে বড়োসড়ো যে-কোনো বিষয়ে তাঁর মতামত নিতে ছুটে যান। গ্রামেরই মানুষজন পালা করে মৌলবি সাহেবের খাওয়া-পরা-চিকিৎসাদির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নেন। গ্রামের এক-এক পরিবারে এক-একদিন করে তাঁর দিবা-রাত্তির আহার-সেবার পালা পড়ে। দুপুরে আহারাদির পর বাড়ির মহিলাদের তিনি ধর্মীয় উপদেশ দেন। এখন বাস্তব ঘটনা হল এই যে, সমাজের অন্যান্য স্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত শক্তিধর কর্তাব্যক্তিদের মতোই, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই ভণ্ড ধর্মীয় নেতারা অহরহ ভণ্ডামি করেন। উঠতে বসতে মিথ্যাচার করেন। নিরক্ষররা কিন্তু জীবন-অভিজ্ঞ এই মহিলাদের চোখকে তাঁরা ফাঁকি দিতে পারেন না। সরাসরি মুখের ওপর প্রতিবাদ করার মতো জায়গায় তাঁরা নেই, কিন্তু 'নিজস্ব মঞ্চ' এই বিয়ের গীতের আসরে তাঁরা কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না।

তো, এরকমই এক গ্রামীণ পরিবারে তার পালার ভোজনটি সেরে মৌলবি সাহেব জ্ঞান বিতরণ করতে বসেছেন—

—প্রেত্যিকিই পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়বা রোজ।
—পড়তি তো চাই মৌলবি ছাহেব, কিন্তুক পড়তি মোরা জানি না।
—তওবা, তওবা—নামাজ জানো না মুসলমানের বিটি, তওবা, তওবা—
—আপনি শিখোয়ে দ্যান যেতি...

এবার নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে মৌলবি—

—আল হাম্‌দোলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন্‌ (জনান্তিকে—
এবার থেকে নাস্তায় দিবে একজোড়া করে ডিম)
একবার করে সিজদার ভঙ্গি আর উচ্চারণ—
মা-লিকে ইয়্যাওমিদ্দিন" (পেশাল করি দাওয়াত দিবে আমায়
প্রেত্যেকদিন)
আবারো সিজদার ভঙ্গিতে—
''ইহদিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকিমা" (বিবিজান তুমায় ছাড়া আর
তো কিছুই বুঝি না)
আবার সিজদার ভঙ্গি—
''সিরাতাল লা-জিনা" (তুমায় আমি ছাড়ছি না।)
আবার সিজদার ভঙ্গি এবং তারপর হাঁটুমুড়ে বসে—
—''ইবার পড়ো সুরাফিল্‌" (তুমায় আমি দিলাম দিল)
—''তাবাদে পড়ো সুরা কাওসার" (অতোখান দূরে রয়োনা
গো আর)
—''তাবাদে পড়ো সুরা ইখলাস" (আস্তে আস্তে তুলোগো
লিবাস)...

এই সময়ে মেয়েরা সমস্বরে বলবে, ''খুব পড়া হইয়েছে মৌলবি সাহেব, ইবার আপনে ছুটি দ্যান।"

''তার আগে হজের ফজিলত টো বলে লিই"—
—জলদি করে বলেন তবে, মেলাই কাজকাম পড়ি রয়িছে
সুমসারের (সংসারের)...
শুরু করলেন মৌলবি সাহেব—
''বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম—
গানের সুরে :
দেখে এ্যলাম কাবাতুল্লা
খেয়ে এ্যলাম পাকাকল্লা
ফির রোজ দিবে গরুর কল্ল্যা (মাথা)
লয়তো বেহেস্ত পাবানা—
শুকুর আলহামদো লিল্লাহ্‌ ইয়া রাব্বানা (দু-বার)
ঘুরে এ্যলাম মদিনাতুল্লা
দেখি এ্যলাম খোদাআল্লা
মোর পাতে দিবে মাছের কল্ল্যা (মুড়ো)
লয়তো শবাব্‌ পাবা না—
শুকুর আলহামদোলিল্লাহ ইয়া রাব্বানা
নামটি আমার আয়াতুল্লা,
ঘুরে এ্যলাম কাবাতুল্লা,
এমুন হাজী পেয়েও বালা
খাতিরদানি করলা না—
শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্‌ ইয়া রাব্বানা।

ঈশ্বর আল্লার নাম ভাঙিয়ে, কিতাবের ছুতো দিয়ে আবহমানকাল ধরে ধর্মব্যবসায়ীরা নোংরা বেসাতি করে এসেছে দুর্বল শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টায়। সমাজসংসার বাস্তবিকই তাদের সম্মান করতে পারে না। ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পাওনা থাকে না এই সব আশারাম, নচ্ছারবাবা রামহরিমের। মানুষকে বোকা বানানো অত সহজ নয়। যারা এইসব ধর্মগুরুর চারপাশে মাছির মতো ভনভন করে তাদের নিশ্চিত অন্য কোনো স্বার্থ আছে। সাধারণ মানুষ এমনকি নিরক্ষর হলেও নিজের সহজাত বুদ্ধিতেই ধরে ফেলে এই কাপট্য। আর তাইতো গ্রামীণ মা-বোনেরা এমন গান ও ব্যঙ্গনাটক রচনা করে, পারফর্ম করে সাবধানবাণী পাঠান—সাধু সাবধান।

With best compliments of

GULSON CONSTRUCTION

CIVIL, REFRACTORY, MECHANICAL & GENERAL ORDER SUPPLIERS

In Front of Hindustan Refractories
Sagarbhanga (Near 112 No. Rail Gate)
Durgapur-11, Dist. Burdwan

Sl. No. 167

প্রস্তুতি

অভিজিৎ কোঙার

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে, সামান্য একটু পেটে দিয়েই রবি সাইকেল নিয়ে রওনা দিল হাটপুকুর মাঠের দিকে। রাস্তায় দেখা বাদলদার সঙ্গে। বাদল দাশগুপ্ত তার ক্লাবের সিনিয়ার খেলোয়াড়। সুঠাম চেহারা, উচ্চতা প্রায় ছ-ফুট। রক্ষণভাগের ফুটবলার। ভালো ফুটবলার হওয়ার সুত্রে রেলে চাকরি পেয়েছে। বাদলেরও সাথি সাইকেল। পাশাপাশি যেতে যেতে বাদল জিজ্ঞাসা করে—তুই কদিন প্রাকটিসে আসিস নি কেন?

প্রথমে রবি কারণ বলতে একটু ইতস্তত করে। কারণ, সমস্যা শুনলেই এবং তা যদি টাকা পয়সার সমস্যা হয় তাহলে বাদলদা তার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলবে—প্রাকটিসটা ঠিক মতো কর। ফাঁকি দিস্ না। তোর খেলায় ভবিষ্যৎ আছে।

শেষ পর্যন্ত বাদলের চাপাচাপিতে সে বলে—বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় দোকান সামলাতে সে কলেজ যেতে বা মাঠে আসতে পারেনি।

এর মধ্যেই মাঠে পৌঁছে যাওয়ায় কথা আর শেষ হয় না।

তখন সময় বিকাল সোয়া তিনটে। কয়েকজন মাত্র মাঠে এসে পৌঁছেছে। যারা এসেছে তারা ড্রেস করতে ব্যস্ত। রবি পোশাক পরেই এসেছিল। শুধু কেডস্‌টা পাল্টে খেলার বুট পরে নিল। আস্তে আস্তে বাকিরা এসে পৌঁছে গেল। প্রথমে যে যার নিজের মতো করে দৌড় ঝাঁপ শুরু করলো। তারপর বাদলের তত্ত্বাবধানে শুরু হল বল ছাড়া, বল সহ, দলগত ভাবে নানা পর্যায়ে কঠিন পরিশ্রম। এটাই রোজকার অনুশীলনের ধারা। সব শেষে রবিকে বাদল বলল—রাত্রে একবার ক্লাবে আসিস।

গ্রামের একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দিঘিরপাড়ে রবির বাড়ি। বাবা ঘনশ্যাম মুদি পাড়ার কাছে পাকা রাস্তার ধারে চা-তেলেভাজার দোকান চালায়। বাড়িতে আর দুটি প্রাণী আছে। একটি গাইগরু ও একটি তার বাচ্চা। ফুটবলার হিসাবে ছেলের প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছায় মা গরু পুষেছে ছেলের পুষ্টিতে দুধের জোগান দিতে। গাই-বাছুর দেখভালের যাবতীয়

কাজ মা করে। গরু এখন দেবতা বনে যাওয়ায় বিক্রি করা যাচ্ছে না। ফলে আর্থিক অনটনের সংসারে এ এক নতুন সমস্যা।

বাদলের কথামতো রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ রবি ক্লাবে পৌঁছালো। ক্লাব তখন ফাঁকা। ক্যারামবোর্ড-দুটি হাঁ করে আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের এক কোণে দু ঝাল তাস পড়ে রয়েছে। রবিকে দেখেই বাদল নড়ে চড়ে চেয়ারে বসে তাকে কাছে আসতে বলে। দেখেই বোঝা যায় যে বাদল তার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

বাদল—কী রে, বাড়িতে কী সমস্যা হয়েছিল বল তো।

রবি—সে অনেক কাণ্ড দাদা। তোমাকে আর কী বলি।

বাদল—বল না।

রবি—আমার বাবাকে পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে এত মেরেছে যে বাবা কদিন দোকান যেতে পারেনি।

বাদল—তোর বাবাকে মেরেছে? পুলিশ? কেন?

রবি—আমাদের চোদ্দ কাঠা জমি আছে। বাবার কাছে শুনেছি যে গোস্বামী জমিদারদের খাস হওয়া জমির অংশ গরিবদের মধ্যে বিলির সময় দাদুও পেয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে বাবা সেটাই চাষ করে।

বাদল—সেটাই তো স্বাভাবিক। তাতে অসুবিধা কী?

রবি—রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার বলছে যে জমিদারের জমি নেওয়াটা অন্যায়। এটা জমি চুরি। তাই জমি ছেড়ে দিতে হবে।

বাদল—তোদের বৈধ কাগজ নেই?

রবি—হ্যাঁ, আছে। ঐ কাগজটাকে পাট্টা না কী বলে। সেটা বাবার কাছে আছে।

বাদল—তাহলে?

রবি—সরকারি পার্টির লোকেরা সে সব মানছে না। বলছে জমি ছেড়ে দিতে হবে। পাট্টা পাওয়া সব চাষিরা সরকারের জমির অফিসে গিয়েছিল।

বাদল—তিনি কী বলেছেন?

রবি—বলেছেন কাগজপত্র তো ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। পার্টির লোকদের সঙ্গে রফা করতে হবে।

বাদল—রফা মানে?

রবি—তা জানিনা। ওটাই বলেছে।

বাদল—তা, তোর বাবাকে পুলিশ মেরেছে কেন?

রবি—বাবা সবাইকে নিয়ে সরকারি অফিসে গিয়ে অফিসারের সঙ্গে তর্ক করেছিল বলে পার্টির লোকেরা বলেছে নেতাগিরি ছুটিয়ে দেবে। পরের রাতেই পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে ঐ সব কথা বলে খুব মেরেছে।

বাদল—বাবা এখন কোথায়? ডাক্তার দেখিয়েছিস?

রবি—হ্যাঁ, ডাক্তার দেখিয়েছি। এখানের হাসপাতালে গেলে যদি আবার মারে, তাই পাড়ার লোকেরা জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। এখন একটু ভালো। আজ থেকে দোকানে যাচ্ছে। কাল পর্যন্ত আমি দোকান চালিয়েছি। দোকান না খুললে তো সংসার চলবে না।

বাদল—উঃ, কী দিন যে এল! আচ্ছা তুই এই টাকাটা নিয়ে যা।

রবি—না, আমি আর টাকা নেব না। বরঞ্চ তুমি আমাদের জমিটা রাখতে পারার ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা দেখ।

বাদল—দেখি, কী করা যায়। তুই এখন বাড়ি যা।

দুজন মিলে ক্লাব ঘরে চাবি দেওয়ার পর যে যার বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বাড়ি আসার পথে রবি মায়ের কষ্টের কথা, সংসারের অনটন, খেলা চালিয়ে যেতে পারবে কিনা ইত্যাদি নানা কথা ভাবতে থাকে। তার মনে হয় বাবার ঘটনাটা বাদলদাকে না বললেই হয়তো ভালো হতো। চায়ের বিক্রেতা যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, বা তেলে ভাজার দোকান চালিয়ে যদি তিনতলা বাড়ি করা যায়, তাহলে শুধু শুধু জমি রাখার ঝামেলায় না গেলেই বোধ হয় ভালো হতো।

এখন ভরা ফুটবল মরশুম। রবি তাই দুবেলাই প্রাক্‌টিস শুরু করেছে। ইন্টার কলেজ প্রতিযোগিতায় যেদিন তার কলেজের খেলা থাকছে সেদিন সে আর সকালে প্রাকটিস করে না। বাদল এখন তার দিকে খুব নজর দিচ্ছে। ইন্টার-কলেজ প্রতিযোগিতার প্রায় শেষ পর্বে কলেজের ফুটবল কোচ বিনতি স্যার তাকে জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয় টিম গঠনের ট্রায়ালে সে ডাক পেয়েছে। তিনদিন ধরে চলা ট্রায়ালের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত দলে সে নির্বাচিত হল। দুদিন পরেই সে বাড়ি হতে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে পনের দিনের আবাসিক ক্যাম্পে যোগ দিতে চলে গেল। আগে কোনোদিন তো সে বাড়ির বাইরে রাত কাটায় নি। তাই বিদায়বেলায় মা ও বোনের চোখের জল সঙ্গী হল।

লড়াই দু-দিকেই চলছে। রবি দলে অপরিহার্য হওয়ার জন্য মন দিয়ে চর্চা করে চলেছে। অন্য দিকে গ্রামে ঘনশ্যাম দোকান চালানোর ফাঁকে হুমকি খাওয়া চাষিদের সঙ্গে জোট বাঁধার আলোচনা চালাচ্ছে। বাদল এখন মাঝে মাঝেই ঘনশ্যামের সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে চাষীদের সঙ্গে। বাদল তাদের বলে—ফুটবল খেলায় যেমন জিততে গেলে সব খেলোয়াড়কে জোট বেঁধে সমান তালে পরিশ্রম করতে হয়, এখানেও তাই দরকার। মনের তাগদ বাড়াতে প্রস্তুতি দরকার। একা, না বোকা।

বাদল সুযোগ পেলে আবাসিক ক্যাম্পে রবির সঙ্গে দেখা করে। সুবিধা-অসুবিধা জেনে নেয় ও পরামর্শ দেয়। তাকে বাড়ির খবর দেয়। রবি বলে—বাড়ির জমির সমস্যাটা একটু দেখো। উত্তরে বাদল বলে—তুই মন দিয়ে খেলে যা। আমি ওটা দেখছি।

পনের দিন আবাসিক ক্যাম্প শেষে বিশ্ববিদ্যালয় দল ওড়িশার বারিপদায় চলে যায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পূর্বাঞ্চল প্রতিযোগিতার জন্য। যাওয়ার আগের দিন বাদলের সঙ্গে ঘনশ্যামও ছেলের সঙ্গে দেখা করে যায়। দল পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ান হয়। ওখান থেকেই দল সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কেরালা চলে যায়।

সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় রবি সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। পুরো দল ফেরার পর সে নিজ রেল স্টেশনে সকাল বেলায় নামে। কিন্তু নেমেই সে খুব দুঃখ পায়। কারণ সে ভেবেছিল যে আর কেউ না থাকুক, বাদলদা নিশ্চয়ই তাকে নিতে স্টেশনে আসবে। স্টেশনে নেমে টোটো করে গ্রামে ঢোকার মুখে বিরাট জটলা দেখে সে খুব ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু একটু এগিয়েই দেখে গ্রামের চাষীরা একতার ঝাণ্ডা নিয়ে দল বেঁধে পাট্টা পাওয়া জমিতে চাষ দিচ্ছে। পরিবারের মহিলারাও জড়ো হয়েছে। আর তার বাদলদা তখন একটা জমির আলের মাথায় দাঁড়িয়ে।

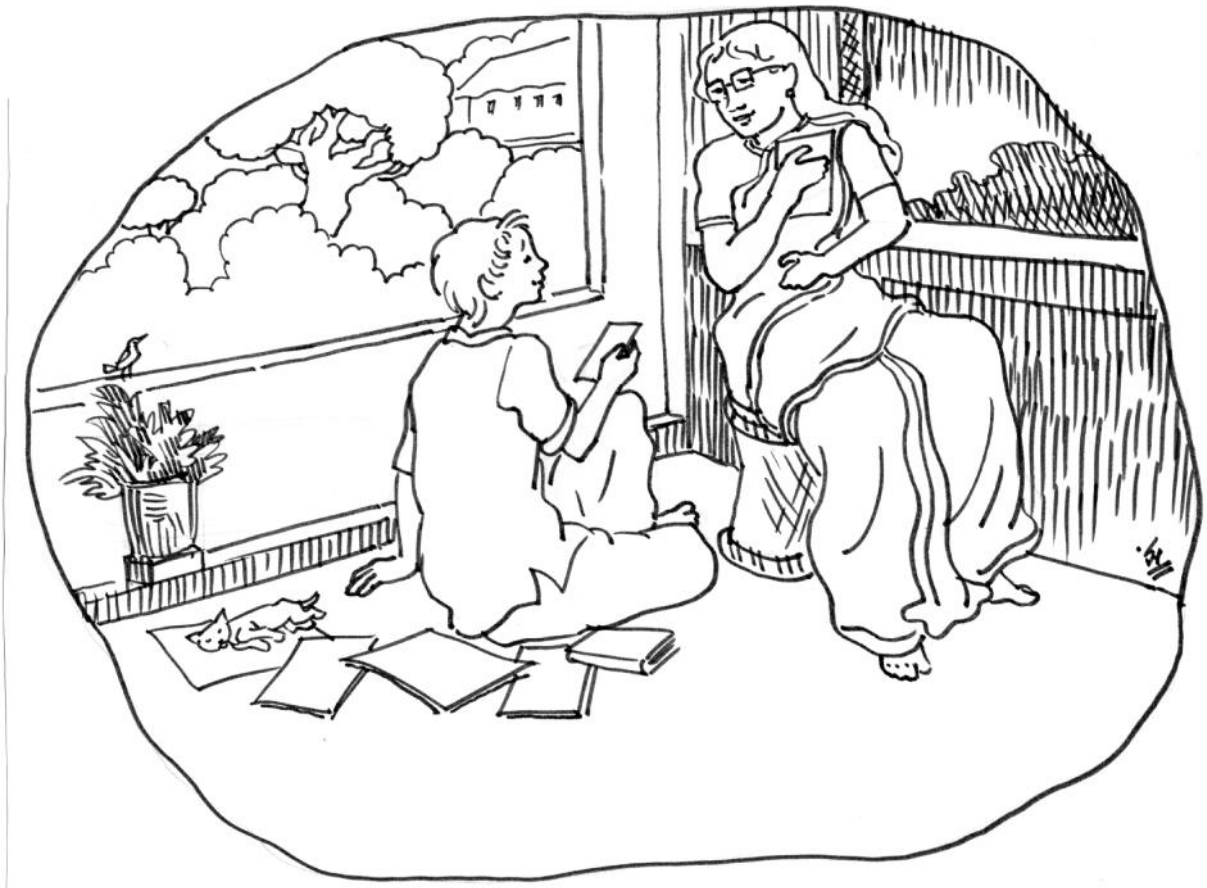

দলছুট

কাকলি ঘোষ

কাঁচা নর্দমার তীব্র দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে। বিশুর হাতে তখনও ধরা মানিব্যাগটা। দারুন দাঁও। পাঁচটা দু-হাজার টাকার নোট। টাকাগুলো চকচকে চোখে গুনতে থাকে। হঠাৎ হাতের ওপর থাবা। পিছন ফিরে দেখে চিকু। ধাক্কা মেরে চিকুকে ঠেলে ফেলে দেয় বিশু—আবার এসেছিল মাতব্বরি করতে। পকেট কাটা চলবে না। লেখাপড়া করতে হবে। এই সব বুকনি অন্য জায়গায় ঝাড়িস। আমার কাছে এসব চলবে না।

চিকু রাস্তার ধুলো ঝেঁড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঠোঁটটা একটু কেটে গেছে। বিশুর হাত ধরে বলে—বেশ তুই তোর মতো কর। একবার শুধু শতভিষাদিদির ক্লাসে চল।

—ছাড় তো ওসব দিদি টিদি। বেশ তো লাইনে ছিলি। এখন আবার কেন? ওসব কেলাস তুই করছিস কর। আমার সব ভালো জানা আছে।

বিশু মোবাইলটা পকেট থেকে বার করে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে শুনতে চলে যায়।

শিয়ালদার এই বস্তিটায় যত রাজ্যের চোর-বাটপারদের বাস। বেশির ভাগই হয় পকেটমার, নয় ভিখারি, না হয় ছিনতাইবাজ। চিকুই এর মধ্যে খাপছাড়া। বিশুদের দলে পড়ে ও কখনো সখনো খিদের জ্বালায় দোকানের পাউরুটি, মিষ্টি চুরি করে খেয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। চিকুর মা তালতলার ওদিকে ফ্ল্যাট-বাড়িগুলোতে পরিচারিকার কাজ করে। চিকু একটা স্কুলে পড়ে। আর শতভিষাদির সান্ধ্য স্কুলে যায়। শতভিষা সৌরভ মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে। শতভিষাদি অন্য সব মেয়েদের থেকে আলাদা। আজকালকার দিদিদের মতো সবসময় মোবাইলে চ্যাট করে না। বরং সান্ধ্যস্কুলে বস্তির বাচ্চাদের পড়ায়। ওদের নিয়ে নাটক করে। ওদের দিয়ে জলসা করায়। চিকুর ভারি ভালো লাগে শতভিষাদিকে। ক্লান্ত পা টেনে চিকু সান্ধ্যস্কুলে যায়। স্কুল বলতে পার্কের একটা কোণে আলোর নিচে গাছের বেদির ওপর ক্লাস।

—কী রে চিকু আজ এত দেরি

করলি? ২৫ বৈশাখের তো আর দেরি নেই। তোর সব সঙ্গিসাথীরা কোথায় গেল? নাটকের রিহার্সাল এখন থেকে শুরু না করলে কী করে হবে!

—কোন নাটকটা হবে দিদি?

—ভাবছি তোদের দিয়ে 'পেটে ও পিঠে' টা করাব। কাল নাটকের বইটা দিয়েছিলাম পড়েছিস?

—হ্যাঁ দিদি। নাটকটা পড়ে খুব হাসি পাচ্ছিল। মুন্নি তো শুনে হেসেই খুন। মাও হাসছিল। মা তো কখনও হাসে না। মাকে হাসলে ভারি ভালো লাগে। ঐ নাটকটাই করব।

দুটো, চারটে করে গুটি কয়েক ছেলে মেয়ে এসে জুটল। শতভিষা বাচ্চাদের নাটকটা পড়ে শোনাচ্ছিল। হঠাৎ দেখে বিশু আর ক্লাবের নেতা জয়ন্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

—এই যে ম্যাডাম, এখান থেকে ইস্কুল ফিসকুলের পাট গোটাতে হবে। আমরা এখানে সন্ধ্যে বেলায় একটু ফুর্তি করব।

—মানে? এটা পাবলিক প্লেস। এটা ফুর্তি করার জায়গা নয়। শতভিষা চেঁচিয়ে ওঠে।

—এই যে ম্যাডাম, সাবধানে থাকবেন। আপনার ওপর অনেকেরই নজর আছে। বেশি বেগরবাই করলে আমিই ফাস্টে টেস্ট করে দেখে নেব।

চিকু আর থাকতে পারে না। জয়ন্তকে ঠেলে মাটিতে ফেলে কিল চড় কষাতে থাকে। বিশু চিকুর ওপর লাফিয়ে পড়ে। শতভিষা, বস্তির কয়েকজন মিলে জয়ন্তর দলকে তখনকার মতো তাড়িয়ে দেয়।

দুই

সন্ধে থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি। অকাল বর্ষার আনন্দে শহর মশগুল। মোড়ের চপ-সিঙাড়ার দোকান থেকে জোরতার ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে। ছেঁড়া চট-ঢাকা বারান্দায় টিমটিমে আলোর নিচে চিকু ক্লাসের পড়া করছে। ছবি উনুনে রান্না চড়িয়েছে। আলুসেদ্ধ ভাত। বাজার থেকে দুটো কানা বেগুন এনেছিল। সেদুটোর একটু ঝাল রাঁধবে। কোলের মেয়েটা খিদেয় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ রাঁধতে রাঁধতে ছবি অনেকগুলো

পায়ের শব্দ শুনতে পায়। চিকুও একটু সতর্ক হয়ে ওঠে—মা, কারা যেন এদিকে আসছে।

মুখ তুলে তাকাতেই দেখে—জয়ন্ত তার দলবল নিয়ে হাজির।

—এই শালা, ওঠ। চল আমাদের সঙ্গে।

—কোথায় যাব? চিকুর গলা শুকিয়ে আসে।

—আরে তোর দিদি। ঐ মালটাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আয়। ভালো বিলিতি মাল এনেছি। আজ ক্লাবে ফুর্তি হবে।

—না না, ও যাবে না। চিকু ও কাজ কখনও করিস না। ছবি আর্ত তিৎকার করে ওঠে।

—তবে রে মাগি। জয়ন্ত চুলের মুঠি ধরে ছবির মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে দেয়।

চিকুকে টানতে টানতে শতভিষাদের বাড়ির দিকে নিয়ে যায়।

—যা, কলিং বেল বাজা। ডাক তোর দিদিমণিকে।

গেট খুলে চিকুকে শতভিষাদের বাড়ির দরজার দিকে ঠেলে দেয়। চিকু উল্টো দিকে পাঁচিল টপকে পালাতে চায়। চিৎকার করে বলে—দিদি, দরজা খুলো না। এখান থেকে পালাও। এখানে আর থেকো না।

জয়ন্ত আর বিশু আরও দু চারজন ছেলে চিকুকে ঘিরে ধরে—চোপ শালা, আর চেঁচালে জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব। চল ডাকবি চল ঐ মাগিটাকে।

—চুপ করো। আমার দিদির নামে কোনো খারাপ কথা বলবে না।

—দিদি? দিদি না তোর ইয়ে। চল শালা। না গেলে মেরে লাশ বানিয়ে দেব।

ইঁট, উইকেট দিয়ে নৃশংস ভাবে ওরা পেটাতে থাকে চিকুকে। চিকু বাগানের ঘাস আঁকড়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে পড়ে মার খায়।

শতভিষা থানায় ফোন করে। পুলিশ যখন আসে চিকু তখন অনেক দূরে চলে গেছে। শতভিষা চিকুর রক্তাক্ত নিথর দেহটা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওর দলছুট ভাইটার থ্যাঁতলানো মাথাটা কোলে নিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে চলে। এই বস্তির সব মানুষগুলোর থেকে আলাদা চিকু। এই স্কুলে আসতে আসতে কখন যেন ও দলছুট হয়ে গেছে। রাতের আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখে কখন মেঘ কেটে তারা ফুটেছে। ঐ দূরে একটা তারা একা একা হাসছে। ওটাই হয়তো ওর দলছুট ভাইটার মতো একা একা আলো দেয়। বড়ো আলোর দরকার ওদের—

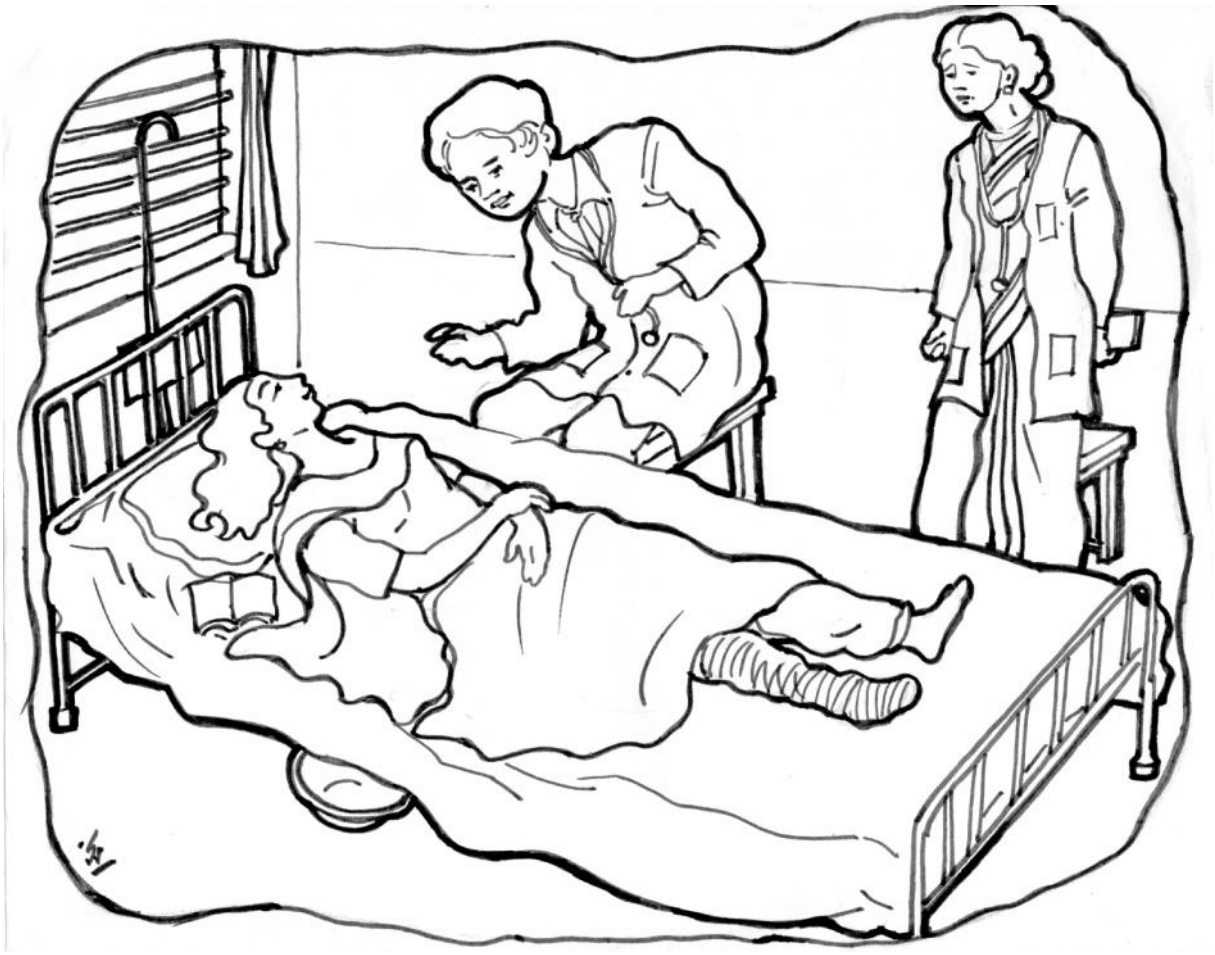

অন্ধ অবেগ

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

দিদি, বেলা তিনটে বাজে, তুমি খাওনি। একটুও কি নিজের কথা ভাববে না? সারাদিন এই অসুস্থ মানুষগুলোর পেছনে বেড়াবে?

তন্দ্রা মাথা তুলে হাসে। এখানে এভাবে ওর ওপর কেউ কথা বলে না, এই মানিয়া ছাড়া।

তন্দ্রা বলে—তুই যা, আমি আসছি। মানিয়া কোনো কথা শোনে না। বাধ্য হয়ে তন্দ্রাকে যেতে হয়। কোয়ার্টারে গিয়ে তন্দ্রা স্নানে চলে যায়। মানিয়া খাবার গরম করে রাখতে থাকে আর ভাবে, হাসপাতালে সকলে দিদিমণিকে ভয় পায় এই গম্ভীর ব্যবহারের জন্য। তার এই রাগী ব্যবহারের জন্য পেছনে আলোচনাও করে। কেউ না জানুক মানিয়া তো জানে দিদিমণি কত ভালোমানুষ, কত হাসিখুশি ছিল।

মানিয়ার এই সুন্দর জীবনটা পুরোটাই দিদিমণির দান। কী ছিল সে! রাস্তার মেয়ে। খুব মায়া হয়েছিল তার, তাকে কাছে রেখে নিয়েছিল। সাধ্য মতো পড়াবার চেষ্টা করেছিল। মানিয়ার ওসব ভালো লাগে না, তাই বেশি এগোতে পারেনি। একটু বড়ো হতে দিদিমণি তাকে হাসপাতালে কাজে লাগিয়েছিল। বাকি সময় সে দিদিমণির কাছেই থাকত। হাসপাতালের কাজের লোক পরমের সঙ্গে মানিয়ার বিয়েও দিয়েছে এই দিদিমণি।

—কিরে, খেতে দিবি না কি চিন্তাই করবি?

দিদিমণির ডাকে চমকে ওঠে মানিয়া—ও তুমি এসে গেছো, বসো খেতে দিচ্ছি।

এখন রাত দশটা বাজে। তন্দ্রার চোখে তন্দ্রার লেশমাত্র নেই। এই কষ্ট সে বহুদিন থেকেই সহ্য করছে। সারাদিন সে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। কিন্তু রাতটুকু তার কাটতেই চায় না। মাঝে মাঝে চলে যায় হাসপাতালে। দ্যাখে সমস্ত রুগিরা

নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। আস্তে আস্তে ফিরে আসে হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টারে। বই-এর র‍্যাকটার কাছে গিয়ে কিছু বই নিয়ে বিছানায় এসে বসে তন্দ্রা। একটা বেশ পুরনো বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে একটা ছবি মাটিতে পরে যায়। তুলে হাতে নেয় সেটা। মনটা মুচড়ে ওঠে। পিঙ্কির পরিবারের সঙ্গে তার আর ডা. শ্রীবাস্তবের ছবি। ছবিটার রঙ মলিন হয়ে এসেছে, তবু মনের ক্ষতটা মুছে যাচ্ছে না। এখনো সেই দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে আসে। সেই জ্বালা, সেই কষ্ট, সেকি ভোলার?

২

পাঁচ-পাঁচ লম্বা. ছিপ্‌ছিপে চেহারা, চোখের মণি খয়েরি ঘেঁষা। ওর চেহারাকে বন্ধুরা যথেষ্ট হিংসা করত, বলত মডেলিং-এ যা, চান্স পেয়ে যাবি। কিন্তু তন্দ্রার মনোবাসনা ছিল অন্যরকম। মানুষের সেবা করার ইচ্ছা তার প্রবল, তাই নার্সিং ট্রেনিং নিল। বোলপুরের মারোয়ারি হাসপাতালে যখন সে জয়েন করল তখন তার বয়স কুড়ি। অর্থপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান সিস্টার। তার বেশ কিছুদিন পর ওই ডিপার্টমেন্টে এলেন ডা. সুজিত শ্রীবাস্তব। সুদর্শন, অমায়িক ব্যবহার, সকলে তাকে খুব পছন্দ করতে শুরু করল। তন্দ্রা হাসিখুশি থাকে ঠিকই কিন্তু একটু শান্ত প্রকৃতি তার। ডা. শ্রীবাস্তবের সমস্ত কেসে ও.টি. টেবিলে তন্দ্রাকে তাঁর চাই। উনিও রুগীর সেবা করতেন মন প্রাণ ঢেলে। জটিল কেস হলে নিজের বিশ্রাম ভুলে সারাদিন সেখানেই পড়ে থাকতেন। সেই সময় তন্দ্রা তাকে জোর করে খাওয়াত। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেলে তার চশমা খুলে রেখে পরম মমতায় তার গায়ে চাদর জড়িয়ে দিত। একটু একটু করে মনের দিক থেকে তন্দ্রা একেবারে ডা. শ্রীবাস্তবের অনেক কাছে পৌঁছে গেল। ডা. শ্রীবাস্তব তাকে খুব পছন্দ করত। কিন্তু সেটা কি ভালোবাসা? তন্দ্রা ঠিক বুঝত না। তন্দ্রা বুঝেছিল ডা. শ্রীবাস্তব ছাড়া সে অচল। কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, সঙ্কোচ এসে ওর মুখ চেপে ধরে। সেই সময় মানিয়া সব বুঝতে পারত। এভাবে কাজের মাঝে কখন বছর তিনেক পার হয়ে গেছে। সেই দিনটা তার মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে, যেন এখনই ঘটে যাচ্ছে সব। সেই দিনটা থেকেই যে তার জীবনের মানেটাই বদলে গেল।

সেদিন ছিল দেওয়ালি। হাসপাতালেও নানা রঙের বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। তন্দ্রা মনস্থির করে আজ সে ডা. শ্রীবাস্তবকে সব খুলে বলবেই। জানতে চাইবে সুজিতের মনের কথা। তন্দ্রার বিশ্বাস ছিল ডা. শ্রীবাস্তবও তাকে সত্যিই ভালোবাসে। বহুবার বলতে গিয়ে নিজেকে সংযত করেছে। কিন্তু আজ সে বলবেই। তন্দ্রা গিয়ে ঢোকে শ্রীবাস্তবের ঘরে। ডাক্তার তখন এক মনে একটা এক্সরে রিপোর্ট দেখছিলেন। তন্দ্রাকে দেখে ডাকেন— আসুন, কিছু বলবেন? আমার মনে হচ্ছে আপনি বিশেষ কিছু বলতে চাইছেন।

—আর আপনি কিছু বলতে চান না ডাক্তার?

—আমি? কই না তো!

তন্দ্রা এর উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হাসপাতালের ভেতরে হৈ চৈ শুনে দু-জনেই উৎকর্ণ হয়। অপর্ণা ছুটে আসে—স্যার, সিরিয়াস পেশেন্ট এসেছে।

দু-জনে বেরিয়ে আসে। ডা. শ্রীবাস্তব দেখে নিয়েই রুগিকে ও.টি.-তে নিয়ে যেতে হুকুম করেন।

দেওয়ালির বাজি ফাটাচ্ছিল ভাইবোন। ছাদের নিচু কার্নিশ। তাদের সাবধান করতে গিয়ে নিজেই নিচে পড়ে গেছে মেয়েটা। বড়োলোকের আদরের মেয়ে পিঙ্কি প্রসাদ। বাঁ হাঁটুর নিচে থেকে তিন খণ্ড হয়ে গেছে হাড়। অপারেশন হয়েছে। পায়ে রড লাগানো আছে। এখনও মাসখানেক থাকতে হবে। এমনিতে ডা. শ্রীবাস্তব রুগিদের প্রতি খুব যত্ন নেন। কিন্তু এর প্রতি যেন একটু বিশেষ নজর, সেটা বোঝা যেতে লাগল। বেশির ভাগ সময় উনি ওখানে পৌঁছে যান, খবর নেন। সামান্য ভুল ত্রুটি দেখলে সকলকে বকাবাকি করেন। সেদিন তন্দ্রা পিঙ্কির হাতটা ধরল ইঞ্জেকশন দেবে বলে। পিঙ্কি আদুরে গলায় বায়না ধরে—'ইঞ্জেকশন নেব না, খুব ব্যথা লাগে।' ডা. শ্রীবাস্তব বললেন—'আমি বসছি, কিছু হবে না।' পিঙ্কি ডা. শ্রীবাস্তবের একটা হাত চেপে ধরল, মুখটা প্রায় তার বুকের কাছে। তন্দ্রার হৃদপিণ্ডটা লাফাতে লাগলো লাগামছাড়া ভাবে, হাতটাকে যেন বশে রাখা যাচ্ছে না। কোনো রকমে ইঞ্জেকশন দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে কেবিন থেকে।

আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সে বেশ বুঝেছে সুজিত আর পিঙ্কির মধ্যে একটা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার ঘটে চলেছে। তন্দ্রা সুজিতকে বলে—স্যার, আমি দুদিনের ছুটি নেব। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।

—ঠিক আছে, আর কদিন পরেই নেবেন। পিঙ্কি যতদিন আছে আপনি থাকুন।

আজ তন্দ্রার অফ্ ডে, কিন্তু একটা বিশেষ ও.টি.-র জন্য ডা. শ্রীবাস্তব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। রাত প্রায় নটা, পেশেন্টদের খাওয়ানো হয়ে গেছে। ডা. শ্রীবাস্তব রাউন্ড দিয়ে এসে তাঁর ঘরে বসে তন্দ্রাকে ডেকে পাঠালেন। অপর্ণা হেসে বলে—যাও তোমার ডাক পড়েছে। আজ সব কথা বোলো, না হলে আর কবে বলবে। তন্দ্রা ম্লান হাসে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই ডা. শ্রীবাস্তব বললেন—আসুন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।

তন্দ্রার বুকের ভেতরে ছলাৎ করে ওঠে। সারা শরীর এক অন্য ভালো লাগায় যেন দুলে ওঠে।

ডা. শ্রীবাস্তব বলতে গিয়ে থেমে বলেন—ও, আপনি সেদিন কী যেন বলতে চেয়েছিলেন? সেই দেওয়ালির রাতে? বলুন কী বলছিলেন?

তন্দ্রা বলে—আপনি বললেই আমার অনেক কথা বলা হয়ে যাবে, বলুন আপনি।

—ঠিক আছে, শুনুন। দু নম্বর কেবিনের পিঙ্কির কাল ছুটি হবে। ও এখন বেশ সুস্থ। এবার আপনিও ছুটি পেতে পারেন। তার আগে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। আমরা অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করছি। আমি মনে করি আপনি আমার খুব ভালো বন্ধু। আপনাকে সব কথা বলা যায়।

তন্দ্রা মনে মনে ধৈর্য হারায়। বলে—বলুন না, সঙ্কোচ কিসের?

ডা. শ্রীবাস্তব বলেন—পিঙ্কিকে আমার খুব ভালো লেগেছে। এতদিন ওর কাছাকাছি থেকে আমার মনে আমি ওকে ভালোবেসেছি। আমি ওদের বাড়ির সকলকে বলেছি। পিঙ্কিকে তেমন ভাবে বলিনি। তবু আমি জানি ও আমার মনের কথা বুঝেছে।

ডা. শ্রীবাস্তব একটা কার্ড বের করে তন্দ্রার হাতে দেন।—এটা ওকে দিয়ে দিতে হবে। ওর মনের কথাটা যদি একচু বুঝে নিতে পারেন। পরে ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে মা কথা বলে নেবেন। কী, পারবেন

না?

তন্দ্রা নির্বাক শ্রোতা হয়ে শুনে গেল সব। যার জন্য একদিনও সে কোয়ার্টার ছেড়ে বাড়ি যায়নি, যার কাজের ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেছে সে। এতদিন পাশাপাশি থেকে ডা. শ্রীবাস্তব তার মনের কথা বুঝলো না! এই কদিনে পিঙ্কির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মে গেল এতখানি। তন্দ্রা জানত ডা. শ্রীবাস্তব বুঝি তাকে ভালোবাসে। তার চাউনিতে, ব্যবহারে তার তাই মনে হতো। যার জন্য সে অন্যখানে বিয়ের কথা ভাবেই না। যাকে নিয়ে সে মনে মনে সংসার রচনা করে ফেলেছে, সে তাকে ভালোবাসে না। এতখানি ভুল তন্দ্রা করল কী করে! চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে যায়। চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

অপর্ণা এগিয়ে আসে—কী, সব বলেছো তো? ওমা, ওটা কী? স্যার তোমাকে দিলেন বুঝি?

তন্দ্রা বলে—দাঁড়া, আমি একটু আসছি।

অপর্ণা ওর চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে বলে—কী হয়েছে তন্দ্রা?

তন্দ্রা কার্ডটা অপর্ণাকে দেয়। কার্ড খুলে পিঙ্কির প্রতি ভালোবাসায় ভরা লেখা পড়ে অপর্ণা চমকে ওঠে—এটা হয় না, তন্দ্রা। স্যার এতখানি নির্মম হলেন কী করে? উনি কি কিছুই বোঝেননি এতদিন! এ হতে পারে না, তুমি ওকে সব বল এখুনি।

তন্দ্রা বলে—থাক অপর্ণা। উনি না হয় নাই ভালোবাসলেন। আমি তো ওকে ভালোবাসি। তাই ওর সুখের পথে আমি কখনই বাধা হতে পারিনা।

তন্দ্রা এগিয়ে যায় পিঙ্কির কেবিনের দিকে। পিঙ্কি বই পড়ছে। তন্দ্রাকে দেখে বলে—আমি কিন্তু আর ইঞ্জেকশন নেব না।

তন্দ্রা বলে—না, তুমি তো সুস্থ। আর কোনো ওষুধের দরকার নেই। নাও ডা. বাস্তব তোমায় কার্ড পাঠিয়েছেন।

তন্দ্রা বেরোতে গেলে পিঙ্কি ওকে ডাকে—সিস্টার, আমার এই কার্ডটা ওকে দিয়ে দেবেন। ওনার জন্য আমার পা-টা একেবারে ঠিক হয়ে গেল।

তন্দ্রা পিঙ্কির কার্ডটা ডা. শ্রীবাস্তবের হাতে দিয়ে বেরিয়ে যেতে গেলে ডাক্তার বললেন—ধন্যবাদ সিস্টার। অনেক উপকার করলেন। মায়ের সঙ্গে কথা বলে সব কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাই। শেষদিন পর্যন্ত আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন তো?

তন্দ্রা মনে মনে বলে—শেষদিন পর্যন্ত আমি তো থাকতেই চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে। কিন্তু বলতে পারে না কিছু। মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ জানায়। তারপর বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

ওই সমস্ত ঘটনার মাঝে তন্দ্রা নানা জায়গায় যোগাযোগ করতে থাকে। ব্যান্ডেলের কাছে এই মিশনারি হাসপাতালটা ওর পছন্দ হয়েছিল। সব আনন্দ অনুষ্ঠান পর্যন্ত সে ওদের সঙ্গে ছিল। অসীম ধৈর্য তন্দ্রার। মানিয়া খুব কেঁদেছিল। ওকে বোঝাতে তন্দ্রার খুব কষ্ট হয়েছিল।

এরপর সে চলে এসেছে এখানে। সে আজ বহুদিন হয়ে গেল। মানিয়া ওর সঙ্গ ছাড়েনি। কতদিন হয়ে গেছে। ধূসর হয়ে গেছিল সেই সব স্মৃতি। আজ আবার সব মনে পড়ে গেল এক লহমায়। আজও সে ভোলেনি সুজিতকে। সে জানে না ওরা কেমন আছে। যেখানেই থাকুক ওরা সুখে থাকুক, এটাই চায় তন্দ্রা।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ মালডাঙ্গা, বর্ধমান, দূরভাষ : (০৩৪২) ২৭৫০৫৮৭

(মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি)

আমাদের পরিষেবা

১. অনলাইন জন্ম-মৃত্যু শংসাপ্রদান, ২. অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, ৩. দিবা-রাত্র অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ৪. সমব্যথী প্রকল্প, ৫. পঞ্চায়েত প্রতিকার, ৬. বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৭. এসসি, এসটি, ওবিসি শংসাপত্র প্রদান, ৮. সার্ভে (পঞ্চায়েতর আমিন দ্বারা), ৯. বার্ষিক আয়-ব্যয়ের ম্যাগাজিন প্রকাশ, ১০. পর্যাপ্ত পানীয় জল।

আমাদের সাফল্য

১. নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতর পুরস্কার, ২. নিজস্ব তহবিলের আয় বৃদ্ধি, ৩. সেলফ হেল্প গ্রুপের নিজস্ব ভবন নির্মাণ, ৪. পঞ্চায়েত স্টলের মেরামতিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ৫. ১২৮৪টি শৌচাগার নির্মাণ, ৬. বাংলার আবাস যোজনায় ১০৪টি গৃহ নির্মাণ, ৭. পঞ্চায়েতের দ্বিতল গৃহ নির্মাণ, ৮. পঞ্চায়েত চত্বরে নিজস্ব নার্সারি, ৯. বোরো চাষের ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের চেক প্রদান, ১০. আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্প (প্রস্তুতির পথে)

স্বপনকুমার রায়
উপপ্রধান

টুম্পা মণ্ডল
প্রধান

Sl. No. 21

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 164

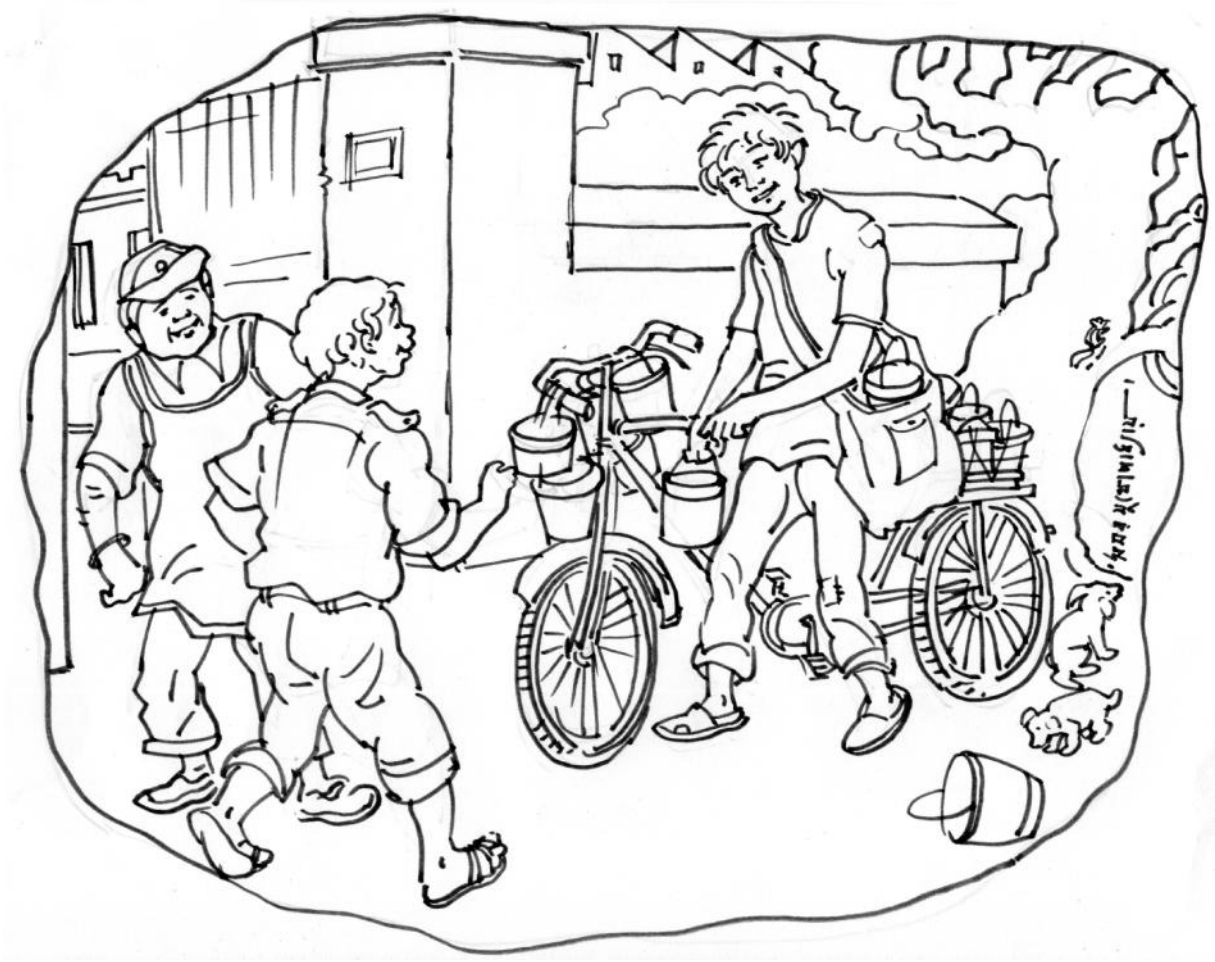

টিফিন-বয়

গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি

নাতিটা সকাল থেকেই খুব জ্বালাচ্ছে। কোনোদিন এরকম করে না, বেশ চুপচাপ থাকে, বইপত্র নিয়ে ছবিছাবা আঁকা অথবা কোনো খেলনা নিয়ে নিজের মনে একাই থাকে। কখনো সখনো ওর ঠাকুমার সাথে এসে খুনসুটি করে। কালেভদ্রে নিষাদের স্টাডিরুমে এসে পড়ার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে কলমগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আলমারির বইগুলোর দিকে ছোটো ছোটো আঙুলগুলো তুলে নিষাদকে নানারকম প্রশ্ন করে হয়রান করে ছাড়ে। ''দাদা ওটা কী বই? ওটা কী বই? এটাতে কী লেখা আছে? কে লিখেছে?'' ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন। ওদিকে পাশের ঘর থেকে ওর মা বুঝতে পারে দাদা এবার উত্তর দিতে দিতে হয়রান, তখন ওর মা গলা ভারি করে হাঁক পাড়ে ''এই দিকে আয়।'' ছেলে তখন আর কথা না বাড়িয়ে মায়ের কাছে চুপচাপ হাজির। মাকেই সমীহ, আর বাড়ির কাউকেই পরোয়া করে না নাতিটা। আজ কিন্তু কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না কর্ণকে। বিচ্ছিরি রকম বিরক্ত করছে। নিজের পড়ার টেবিল থেকে উঠে আসে নিষাদ। সটান গিয়ে ঢোকে সরমার রুমে। সরমা নিষাদের স্ত্রী, সরমা তখন একটা বিছানায় চাদর পেড়ে ভাঁজ করছিল, ইশারায় চোখ নাচিয়ে নিষাদ জানতে চায়—''কী ব্যাপার?'' চাদর ভাঁজ করতে করতেই সরমা বলে, ''আর বোলো না, তোমার গুণধর ওকে রোজ সকালে ক্যাডবেরি খাইয়ে খাইয়ে এমন করে তুলেছে যে ঘুম ভেঙেই সোজা ফ্রিজের দিকে ছুটবে। আর আজ ওটা না পেয়েই যত হামলা।। ''ও, এই ব্যাপার?'' বলেই আর কথা না বাড়িয়ে নিষাদ নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে একটা লজেন্স বার করে। ব্লাড সুগারটা এক সময় ফল করে গিয়েছিল। ফলে এক সময় সাংঘাতিক অসুবিধা হয়েছিল নিষাদের। তখন থেকে

ডাক্তারের পরামর্শ মতো নিজের কাছে দু-চারটে লজেন্স রাখে। ওখান থেকে একটা বার করে নিয়ে এসে কভারটা খুলে লজেন্সটা নাতিটাকে ডেকে ওর হাতে ধরিয়ে দেয়। কিন্তু হাতে নেড়েচেড়ে দেখে নাতিটা বুঝতে পারে এটা ক্যাডবেরি নয়। একবার মুখ দিয়ে আবার বার করে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ''আহা আহা কী করছ?'' বলে নিষাদ আবার ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ভালো করে মুছে ওটা আবার নাতিটাকে দেবে না ফেলে দেবে এটা ভাবতে খানিকটা সময় নিয়ে আবার ওটা নাতিটার হাতে দিতে যায়। ওদিকে গোটা ব্যাপারটা নিনি লক্ষ করছিল, নিষাদের কাণ্ড দেখেই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে—''আরে কী করছেন? ওটাই দিচ্ছেন? জানেন তো ওর মধ্যে এখানো সেভাবে ইমিউনিটি গড়ে ওঠেনি, এই ময়লা লজেন্সটা খেয়ে আবার অসুখে পড়বে—দিন আমার হাতে।'' বৌমা নিনির এরকম গলার আওয়াজ কোনোদিন শোনেনি নিষাদ। অবাক হয়ে নিনির দিকে তাকিয়ে থাকে, এদিকে নিনি হাত বাড়িয়ে বলে চলেছে, ''দিন দিন আমাকে দিন, কী করছেন? কত ক্ষতি হাতে পারে জানেন?'' কম কথার মানুষ নিষাদ আর কিছু না বলে লজেন্সটা দিয়ে দেয় নিনির হাতে, নিনি ওটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিচের তলায় বাগানে।

পাশের ঘর থেকে সরমা সবটাই লক্ষ করছিল। বেরিয়ে আসে, কিন্তু নিষাদ ওকে আর কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে বসে প্লেটে রাখা চায়ের কাপটা নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আপন মনে টানতে টানতে শুনতে পাচ্ছে শাশুড়ি-বৌমার কথোপকথন—''নিনি, তুমি ওনাকে এভাবে কথা না বললেই পারতে—তুমি তো ওটা নিয়ে রেখে দিয়ে পরে ফেলে দিতে পারতে? ওনার সামনেই বলতে হবে?''—''কেন ফেলব না মা, উনি কি জানেন না এতে অনেক ক্ষতি হতে পারে?—তবুও কেন করলেন?'' সরমা আর কোনো কথা না বাড়িয়েই বলে, ''আরে উনি তো ওইভাবেই মানুষ, এখনো সেই ভাবনাটই আছে, তোমাদেরও একটু মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়া দরকার।'' নিনি এমনিতে খুব ভালো মেয়ে—বেশ সংস্কৃতি মনস্ক, বড়দের সম্মান করে বলল—''ঠিক আছে মা, আপনি যখন বলছেন আমি বাবাকে গিয়ে বলে আসছি যে উনি যেন রাগ না করেন।''—''সেটা আর তোমাকে বলতে হবে না, আমি ওটা ঠিক করে নেব, তুমি কর্ণকে সামলাও,'' বলেই সরমা আবার নিজের ঘরে কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

নিষাদের পড়ার টেবিলের ডানদিকের কোণে মায়ের ফটোটার দিকে তাকিয়ে আছে নিষাদ। কী মনে করে কে জানে! হাত বাড়িয়ে ছবিটা টেনে আনে। পরম যত্নে মায়ের ছবিটার কাঁচটা আর ফ্রেমগুলো নিজের পাঞ্জাবির ঝুল দিয়ে মুছে আবার যথাস্থানে রাখার পর আরেকবার আয়নায় মুখ দেখার মতো মায়ের ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিষাদ। মা হাসছেন। যেন বলছেন, ''কী রে! বলেছিলাম না যে যখন ছেলেমেয়েরা বাপ হবি তখন বুঝবি কত জ্বালা! এখন দেখছিস তো সংসারে শান্তির স্বার্থে বাবা-মায়েদের অনেক কিছুই সহ্য করতে হয় বাবা।'' নিষাদের ভেতরটা কেমন যেন হু হু করে ওঠে। মনে মনে বলে ওঠে, আর কত সহ্য করব মা! ছোটোবেলায় যখন একসাথে ভায়েরা খেতে বসতাম, একটা ভাত মাটিতে পড়লে কুড়িয়ে খেতে বলতে, বলতে ভাত হল লক্ষ্মী, ফেলবি না, কুড়িয়ে খা। একটা ডিমকে ভেঙে আলু দিয়ে মেখে ডিমের গন্ধ দিয়ে কতদিন যে খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। ওঃ সে দিন কি ভোলা যায়? কী দারিদ্র্য, বাপরে! এর মধ্যেই তো একদম বস্তির মাঝে একটা কামরার ভাড়া বাড়ি। পাশে খাটা পায়খানা। দুবেলা কুয়ো থেকে ব্যবহারের জল তোলা, এক কিলোমিটারের বেশি দূর থেকে কোম্পানির পাইপ লাইনের সরবরাহ করা খাওয়ার জল বয়ে নিয়ে আসা। সে কী রকম জীবন ছিল বলতো? মনে পড়ে, বাড়িতে যেদিন প্রথম রান্নার জন্য প্রেসারকুকার নিয়ে এলেন বাবা, সেদিন কীরকম আনন্দ আমাদের? কত রাত পর্যন্ত জেগে ওটার পাশে বসেছিলাম। বাবা বলছিলেন এতে নাকি মাংস দারুন সেদ্ধ হয়। খাবার খুব ভালো রান্না হয়। পরদিন মাংস হবে, কী উত্তেজনা মনে পড়ে! প্রেসার কুকারের যখন প্রথম সিটি পড়ল, উত্তেজনায় থরথর, তারপর সাতটা সিটি হওয়ার পর বাবার কী ভাষণ! তোমাকে প্রেসার কুকার নিয়ে কত জ্ঞান, মনে পড়ে সব! আর আজকে একটা লজেন্স মাটি থেকে কুড়িয়ে—

হঠাৎ চমক ভাঙে নিষাদের, সরমার আওয়াজে—''কী হল গো, চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কী অত ভাবছ? প্রায় মিনিট পাঁচেক তোমাকে দেখছি, তুমি খেয়ালই করনি?'' চেতনার জগতে ফিরে আসে নিষাদ। হুড়মুড় করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে উত্তর দেয়—''নাঃ, কী আর ভাববো? মনে মনে জিজ্ঞাসা করছিলাম কেমন করে সমাজ, চেতনা, ভাবনা, সংস্কার সব দিনের পর দিন পাল্টে যাচ্ছে। তাই একটু তুলনা করছিলাম আর কি!'' সরমার চেহারা বেশ স্লিম, বছর কয়েক ধরে কেমন যেন মোটা হয়ে গিয়েছে। কপালের পাশে চুলগুলোয় পাক ধরেছে। বেশ গিন্নিমা গিন্নিমা চেহারা হয়েছে। নিষাদের বেশ ভালোই লাগে, ইশারায় সামান্য কাছে ডেকে নেয় সরমাকে। সরমা আরো কাছে চলে আসে নিষাদের।

সরমার হাতে হাত রেখে নিষাদ বলে ওঠে—''না সরমা এটা ভালো না, সন্তানদের এভাবে মানুষ করতে নেই, তাকে বুঝতে হবে সবটা সহজে পাওয়া যায় না, পাওয়ার জন্য লড়তে হয়—কখনো হারা কখনো জেতা এভাবেই এগিয়ে যেতে হয়। দেখছো না কর্ণটা ইদানীং কেমন জিদ্দি হয়ে উঠেছে—ওকে সামলাও, আর তোমরা যদি না পার আমি নিশানকে বলব।'' সরমা ঝাঁকিয়ে ওঠে—''কী হয়েছে বলতো? ওদের নিজের মতো থাকতে দাও, নতুনকে মেনে নেওয়াই ভালো, আমরা এসব বলতে গেলে বলবে আমরা পুরোনো ভাবনার মানুষ। তখন কি তোমার ভালো লাগবে?'' নিজেই নিজের উত্তর দেয় সরমা—''না মোটেই লাগবে না। আমি তো তোমাকে জানি, এসব সহ্য করতে পারবে না। শেষে হয়ত আমার সংসারটাই গোলমাল হয়ে যাবে। তা থাক না ওরা ওদেরটা বুঝুক, আমরা আর কতদিন? চল এভাবেই বাকি দিনগুলো চালিয়ে নিই।'' নিষাদ কী যেন ভাবে। তারপর বলে ওঠে—''তাই হবে।''

সরমা বেরিয়ে যেতেই নিনি হঠাৎই ওর ঘরে প্রবেশ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ইশারায় নিষাদ জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার? নিনি আঁচল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে হাত বাড়িয়ে লজেন্সটা নিষাদের হাতে দিয়ে বলে, ''এবার যা করার করুন—কর্ণকে দেবেন?'' খুবই অপ্রস্তুত হয়ে নিষাদ বলে ওঠে, ''আহাঃ আহাঃ এটা খুঁজতে গেলে কেন? দাও দাও ফেলে দিই।'' নিনি বাধা দেবার আগেই নিষাদ ওটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে

দিয়ে বলল, ''তুমিও তো দেখছি কর্ণের মতো জিদ্দি হয়ে গেলে? এমনটা করে?'' নিনি লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, ''আসলে কী জানেন, আমি আপনার সাথে যেভাবে কড়া কথা বলে বসলাম নিজেরই খুব খারাপ লাগছে।'' ''ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না—'' বলেই নিষাদ বিড়বিড় করে বলে ওঠে—''যত্ত সব বাচ্চা ছেলের কাণ্ড।'' এবার নিনি খানিকটা সাহস পেয়ে নিষাদকে বলে, ''শুনলাম কাল নাকি কলকাতায় আপনাদের কি প্রোগ্রাম আছে? এত গরমে না গেলেই নয়? এই তো আপনার হার্ট অপারেশনের পর ছয় মাসও পার হয়নি, যেতেই হবে?'' নিষাদ খানিকটা ভেবে বলল, ''আসলে আমার আর রিটায়ারমেন্টের মাস কয়েক বাকি, রাজ্যের সমস্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যাচ্ছেন। আর আমি যদি না যাই সেটা ভালো হবে না। সেজন্যই যাওয়া। আর তেমন অসুবিধা হলে অনেক সহকর্মী থাকবেন। কোনো অসুবিধা হবে না।'' ''তবুও''— বলেই নিনি কী যেন বলতে যায়—নিষাদ ওকে মানা করে বলে ওঠে, ''না না কিচ্ছু হবে না, তোমরা অত ভেবো না, আমি ভালো ভাবেই ফিরে আসবো।'' আর কথা বাড়ায় না নিনি।

কোলকাতায় প্যাচপ্যাচে গরম। পাঞ্জাবিটা ঘামে ভিজে একসা হয়ে গিয়েছে। সাথে ব্যাগপত্র, জলের বোতল নিয়ে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষাদের বরাবরের অনীহা। নিষাদের আজ বাড়ি থেকে বার হবার সময় নিনি একটা হ্যান্ডব্যাগে এক বোতল জল নিয়ে দিতে এসেছিল। নেয়নি নিষাদ। এখন ভাবছে জলের বোদলটা আনলেই ভালো হতো। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে যদি কোথাও জল বিক্রি হয় তো কেনবার জন্য। কিন্তু পাশের চওড়া রাস্তা দিয়ে এত জোরে জোরে গাড়ি যাচ্ছে যে দৌড়ে পার হতে আর সাহসে কুলোচ্ছে না নিষাদের। কিছুক্ষণ একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে রাস্তা পার হবার প্রস্তুতি নিল নিষাদ।

এমন সময় সামনে এক ভদ্রমহিলা, মনে হয় এই সমাবেশেই এসেছেন, তার ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে খানিকটা মুখে ঢেলে নিয়ে বাকিটা নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিতে উদ্যত হতেই, নিষাদ খানিকটা জেদের বসেই বলে উঠল, ''ম্যাডাম, একটু বোতলটা দেবেন, খুব তেষ্টা পেয়েছে, জল যে কিনব তার জন্য রাস্তা পার হতে দৌড়ানোর সাহস হচ্ছে না।'' ভদ্রমহিলা কোনো কথা না বলে ব্যাগটা খুলে জলের বোতলটার ছিপি খুলে বোতলটা নিষাদের দিকে বাড়িয়ে দল। হাতে যেন স্বর্গ পেল এরকম ভাব দেখিয়ে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে প্রায় সবটা ঢক ঢক করে খেয়ে খানিকটুকু রেখে ওটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থেকে বোতলটা ফেরত দিতে গেল—যেন ওটুকুও খেতে পেলে ভালোই হত। ভদ্রমহিলা নিষাদের অবস্থা দেখে প্রশ্ন করল—''আরও চাই? খেয়ে নিন।'' বাক্যব্যয় না করে নিষাদ পুরোটা খেয়ে ওনার হাতে ফেরত দিতে গিয়ে বোতলটা একমনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল, এমন বোতল সাধারণত এয়ারপোর্টের ভেতরে বিক্রি হয়। সেটা বুঝতে পারলেও কোনো কথা না বলে বোতলটা ওনার হাতে ফেরত দিল। ভদ্রমহিলা একমনে নিষাদের দিকে লক্ষ করছিল। বোতলটা ব্যাগে পুরে নিয়ে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও কী মনে হল আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ''আচ্ছা, আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে, কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'' —''কত মানুষ প্রায় এক রকমের থাকে দুনিয়াতে। আমিই কি একটি আছি নাকি এরকম? হয়তো আমার মতো কাউকে কোনোদিন কোথাও দেখে থাকবেন। হতেই পারে—'' নিষাদের এই উত্তরে মনে হয় সন্তুষ্ট হলেন না ভদ্রমহিলা। বললেন, ''না, যেন মনে হচ্ছে কোথাও দেখেছি।''

আনমনে দু-জনেই সভাঘরে ঢুকলো। সভার শেষে নিষাদ ওঠার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে ভদ্রমহিলা কয়েক কদম এগিয়ে এসে বললেন, ''আচ্ছা আপনি কি চিত্তরঞ্জনে থাকেন?''

নিষাদ উত্তরে বলে, ''না থাকি না, তবে একসময় থেকেছি যখন ওখানে পড়াশোনা করতাম।'' এবার ভদ্রমহিলা কলেজের নাম বলতেই চমকে ওঠে নিষাদ। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বলে, ''কে বলুন তো আপনি, আমায় চিনতেন নাকি?''

ভদ্রমহিলা বললেন, ''আমায় চিনতে পারছো না নিষাদ? ভালো করে দেখো তো?'' দু-চার জন বন্ধুবান্ধব ছাড়া ইদানীং 'তুমি' বলে ডাকবার মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, হঠাৎ এই 'তুমি' তারপর এখানে এই সমাবেশে? মনে মনে ভদ্রমহিলাকে চেনার জন্য নিজের চেনামুখগুলোর সাথে ছবির মতো মেলাতে চেষ্টা করে ভেসে ওঠে নানা মুখ। আরে এ কী? কাকে দেখছে? এত বছর পর কোথা থেকে হাজির? মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে নিষাদের। উঠতে গিয়েও ধপ করে বসে পড়ে নিষাদ। হাত বাড়িয়ে নিষাদকে ধরে ফেলেন ভদ্রমহিলা। এবার ধাতস্থ হয় নিষাদ, ধীরে ধীরে বসে পড়ে। ওরা বসে আছে পাশাপাশি। ভালো করে নিষাদ স্বাতীকে দেখতে থাকে। কেমন যেন পাল্টে গেছে স্বাতী, আগের থেকে অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্না। সামনের চুলগুলো রুপোলি আকার নিয়েছে, কপালে সবুজ টিপ ফর্সা মুখটাকে আরও মায়াবী করে তুলেছে। অনেক চেষ্টা করে মাথায় সিঁদুরের ছোঁয়া না দেখতে পেয়ে নিষাদ প্রশ্ন করে—''কী করছ স্বাতী, কতদিন পরে দেখা হল বলতো? তুমি কি এখনো ঘর বাঁধোনি স্বাতী?'' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাতী ধীরে ধীরে বলে, ''তারপর আমি তো কানপুর থেকে পড়াশুনা শেষ করে দিল্লিতে একটা কলেজে অধ্যাপনা শুরু করি। বিয় হয় কোলকাতারই ছেলে অয়নের সাথে। কিন্তু তিন বছর হল অয়ন নেই। এখন আমি আর আমার সন্তান—দুজনেরই সংসার। আগামী জুলাইতে চাকরি থেকে অবসর। তোমার কী খবর?'' —''কী আবার, স্ত্রী-পুত্র, পুত্রবধূ নিয়ে সংসার। এই নভেম্বরে অবসর। তারপর আর কী, এভাবেই চলতে থাকবে যেমন চালালাম এতদিন, সেরকম করেই—'' উত্তর দেয় নিষাদ।

ফেরার তাড়া ছিল। অনেক কথা বলারও ছিল নিষাদের। মনে হয় স্বাতীরও ছিল কিন্তু এখন দুজনেই দুই নৌকার যাত্রী। পথ আলাদা, দুজনেই উঠে পড়ে। কী মনে হতে এবার স্বাতীকে প্রশ্ন করে, ''একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না কর—তোমার ফোন-নম্বরটা দেবে? যদি দরকার পড়ে ফোন করব। করতে পারি তো? অসুবিধা নেই তো?'' ফোন-নম্বরটা বলে স্বাতীর উত্তর—''না না, কিসের অসুবিধা? কোনো সমস্যা নেই। তুমি ইচ্ছে হলেই ফোন করতে পারো। আর আমারও অনেক প্রশ্ন, অনেক বোঝাপড়া আছে তোমার সাথে। ভেবেছিলাম এ জীবনে আর সুযোগ হবে না। কিন্তু যখন সূত্র একটা পেলাম আমাকে এর সমাধান করতেই হবে।''

পাল্টা নিষাদ বলে ওঠে, ''আমারও আছে স্বাতী। আমারও কিছু প্রশ্ন আছে।

জানতে হবে কেন এমন হল, কেন এভাবে যাত্রাপথ পৃথক হল। কী ছিল সেই বাধা?" নিষাদই ফোন-নম্বরটা নিয়ে পাল্টা রিং করে স্বাতীর নম্বরে।

সভাঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে এসব কথা বলতেই ওদের পাশে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। এক সুবেশ যুবক গাড়িটা চালাচ্ছিল। স্বাতী পরিচয় করিয়ে দিল, ''আমার ছেলে—যাজ্ঞ্য। চলো তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিই। যাবে?" নিষাদ ওর বাকি সহকর্মীদের এগিয়ে আসতে দেখছিল। বলল, ''না, ওদের সাথেই যাবো, আচ্ছা চলি, ভালো থাকবে।" ওরা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আবার হল বিপরীতমুখী।

আজ নিষাদের জন্মদিন। নিজের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী—এসব পালন করার অভ্যাস কোনোদিনই ছিল না নিষাদের। ছোটোবেলাতে জন্মমাসে মা চুল কাটতে দিত না, এটা মনে আছে নিষাদের। আর মা-ও নিজের নখ কাটতো না। ছেলের নাকি অমঙ্গল হয়। সেদিন এক বাটি পায়েস রান্না করে খাবার আগে মা বলত, এটা আগে খেয়ে নে, পরে ভাত খাবি। ব্যাস, এটুকুই ছিল জন্মদিনের উৎসব। তারপর যখন বড় হল, এসব উঠে গেল। শুধু জন্মমাসটা এলে মনে পড়ত আমার জন্ম মাস, আর কিছু না। ছেলে নিশানের বিয়ে হওয়ার পর থেকে বৌমা নিনিই সরমার কাছ থেকে বিয়ের দিন আর নিষাদের জন্মদিনটা জেনে নিয়েছে। বছর পাঁচেক হল আবার শুরু হয়েছে নিষাদের জন্মদিন পালন। তবে মোমবাতি জ্বালানো এবং নেভানো, কেক কাটা এসব কিছুই হয় না, শুধুই পুত্র আর পুত্রবধূ মিলে সেদিন নিষাদের স্টাডিরুমটা ভালোভাবে সাজিয়ে তোলে। এক প্যাকেট মিষ্টি আর একজোড়া পাজামা পাঞ্জাবি। আর একটু ভালোমন্দ খাবার এটুকুই সেদিনের উৎসব। এসব ভালো না লাগলেও নিষাদ মেনে নেয়, পাছে ওরা আবার সেকেলে মনে করে। নতুনকে মেনে নেওয়া, তার জন্য জায়গা প্রস্তুত করে দেওয়ার মানসিকতা না থাকলে তো সে সমাজ অচল। আর নিজেকে এই অচলদের দলে রাখতে আদৌ মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় নিষাদ।

আজকে একই রকম হল। কিন্তু ছেলে বৌমার হাতে আজ মিষ্টির প্যাকেট থাকলেও পাজামা পাঞ্জাবির প্যাকেট নেই। বদলে একটা দামি মোবাইল ফোনের প্যাকেট। নিনি ওটা নিষাদের হাতে তুলে দিতেই নিষাদ বলে ওঠে, ''এটা আবার কেন? আমার ফেসবুক, মেইল, ট্যুইটার—কোনো দরকার নেই বাবা, আমার তো আছে একটা?" বলেই মান্ধাতা আমলের মোটোরোলা সেটটা দেখিয়ে বলে, ''এটাতেই তো হয়ে যায়, আবার ওটা কেন? এত দামি অ্যান্ড্রয়েড সেট নিয়ে আমি কী করব?" নিনি বলে ওঠে, ''কী করবেন মানে? এই দাদুমার্কা ফোন নিয়ে ঘুরবেন নাকি? আপনার কলেজের সহকর্মীরা যখন আসে ওঁদের হাতে কত দামি ফোন, আর আপনি একটা দাদুমার্কা ফোন নিয়ে বসে থাকেন। আমাদের ভালো লাগে বুঝি? দিন আপনারটা দিন তো—" বলেই নিষাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ফোনটা নিয়ে সিমটা বের করে বাড়ির পাশেই একটা ফোনের দোকানে গিয়ে সিমটা কাটিয়ে, নেট কানেকশন সহ বেশ কিছু টাকা রিচার্জ করে দেয়। খানিক পরেই ফোনের নানা কারিকুরি এমনভাবে নিষাদকে দেখাতে লাগল যেন ওসবের ব্যবহার নিষাদ কিছুই জানে না! নিষাদ কিন্তু আধুনিক দুনিয়ার সাথে পুরোদস্তুর পরিচিত। প্রয়োজনে কলেজের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট নিজেই অফিসের মধ্যে ব্যবহার করে। তবুও ওদের খুশি করার জন্য যেন কিছুই জানে না এমন ভাব নিয়ে শিক্ষার্থীর মতো শিখতে লাগল।

নাতিটা এখন খানিকটা বড় হয়েছে। মায়ের ফোনটা ছুঁতে মানা। ঠাকুমার ফোন নেই, বাবারটা দূর অস্ত, ইদানীং দাদুর ফোনটা নাড়াচাড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রায়ই কর্ণ এসে হাজির হয় নিষাদের ঘরে ওর ফোনটা নিয়ে গেম খেলতে। মায়ের আওয়াজ পেলেই এতটুকু ছেলে বুঝতে পারে ফোন হাতে দেখলেই মা বকবে, তাড়াতাড়ি দাদুর ফোন দাদুর হাতে দিয়ে এক ছুটে মায়ের কাছে হাজির হয় কর্ণ। নিষাদ এসব বেশ উপভোগ করে আর কর্ণকে মানাও করে না। ইদানীং কর্ণর সাথে নিষাদের ভালোই সময় কাটে। প্রথম প্রথম যখন অন্য বন্ধুদের কাছে ওদের নাতির কাণ্ডকারখানার গল্প শুনত, ভাবত এ আবার কী আদিখ্যেতা রে বাবা! কিন্তু এখন নিষাদ বুঝতে পারছে দাদু হওয়ার স্বাদ আলাদা। আর নাতির সাথে খেলা করা, তার সাথে আধো আধো বুলিতে কথা বলা যে এক স্বর্গীয় অনুভূতি, এ অনুভূতি আবার সকলের সাথে গল্পের আকারে না বললে তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করা যায় না। মাঝে মাঝেই নিষাদের টেবিল থেকে ফোনটা নিয়ে উধাও হয়ে যায় কর্ণ। দেখেও না-দেখার ভান করে নিষাদ। ওদিকে নিনি এটা দেখতে পেয়ে কর্ণকে বকাবকি করে ফোনটা ওর কাছ থেকে কেড়ে এনে নিষাদকে ফেরত দিতে দিতে অনুযোগের সুরে বলে, ''বাবা, আপনি বকবেন তো! যত লোভ আপনার ফোনে, ভালো করে রেখে দেবেন। এরপর থেকে যেন আর খুঁজে না পায়।" কোনো কথা না বাড়িয়ে মুচকি হেসে হাত পেতে ফোনটা নিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দেয় নিষাদ।

আজ দুপুরে নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিল নিষাদ। সরমা পাশের ঘরে নাতিটাকে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। নাম্বারটা সেভ করা নেই, কে ফোন করছে বোঝা না গেলেও নিষাদ ফোনটা ধরতেই ওপার থেকে মহিলা কণ্ঠ—''আমি কি নিষাদ রায়ের সাথে কথা বলছি?" নিষাদের উত্তর, ''হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে বলুন তো, ঠিক বুঝতে পারছি না।" ওপার থেকে উত্তর আসে, ''আমি স্বাতী বলছি নিষাদ। কেমন আছো? তুমি কি আমার নাম্বারটা সেভ করে রাখতে ভুলে গেছ নাকি?" হুড়মুড় করে নিষাদ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখে নেয়, সরমা কী করছে। দেখে সরমা নাতিসাহেবকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার ফোনটা নিয়ে চলে আসে নিজের স্টাডি রুমে। বলে, ''কী ব্যাপার, কোথা থেকে বলছ স্বাতী, কোলকাতা থেকে?" স্বাতী উত্তর দেয়, ''না, দিল্লি থেকে বলছি, তোমার নাম্বারটা নেওয়ার পর সেদিন থেকেই ভাবছিলাম ফোন করব, হয়ে ওঠেনি। আজ করেই ফেললাম।" নিষাদ স্বাতীকে ফোনটা হোল্ড করতে বলে আর একবার উঁকি মেরে দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, কেউ আশেপাশে আছে কি না। কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে বলে, ''কী ব্যাপার, কীভাবে এতদিন ভুলে থাকলে স্বাতী? একটি বারের জন্য যোগাযোগের কথা মনে পড়ল না? বিয়াল্লিশটা বছর এভাবে থাকতে পারলে? সেই যে কলেজ থেকে উবে গেলে আর যোগাযোগ করলে না পর্যন্ত? কী অপরাধ করেছিলাম আমি? একটি বার জনালেও না, কোথায় চলে গিয়েছিলে স্বাতী?" প্রশ্নের থেকে অধিক পরিমাণে ক্ষোভ, দুঃখ রাগ ঝরে পড়ছিল নিষাদের গলায়। স্বাতী কিছুক্ষণ চুপ করে

থেকে বলে উঠল, ''কী বলছ নিষাদ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। জানো, তোমাকে পর পর ১৫-২০টা চিঠি লিখেছিলাম। তোমার সাথে যোগাযোগের কত চেষ্টা করেছিলাম। উত্তর দিয়েছ একটারও? তা না, এখন বলছ, কোথায় উবে গেলাম? আকাশ থেকে পড়ে নিষাদ বলে, ''চিঠি? কই আমি তো একটাও পাইনি। বরং আমিই তোমাদের বাড়িতে কতবার গিয়েছি কিন্তু গেটের বাইরে থেকে তোমাদের বাড়ির দারোয়ান আমাকে দেখেই বলে দিত, ''দিদি নেই, আপনি আর আসবেন না।'' একদিন তো তোমার দাদা আমাকে আচ্ছা করে অপমান করে তাড়িয়েই দিল। আর তুমি বলছ চিঠি দিয়েছ? তোমাদের বড়লোকদের এমনটাই কাণ্ডকারখানা। এমনটা তো হবার কথা ছিল না—কেন এমন হল স্বাতী? কত যন্ত্রণা পুষে রেখেছি জানো? আর তুমি বলছ খোঁজ করেছিলে? তা হলে আমি জানতাম না?'' ধরা গলায় স্বাতী বলে, ''বিশ্বাস কর, আমি কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম... খুব চেষ্টা করেছিলাম। পরে যখন তোমার দিক থেকে আর কোনো সাড়াই পেলাম না, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে এসব...।'' ফোনটা কেটে গেল, বহুবার চেষ্টা করেও আর লাইন পেল না নিষাদ। ফোনটা কয়েকবার নাড়াচাড়া করে হতাশ হয়ে রেখে দিল। নিজের মনে মনেই বলে—নাঃ, আর কী হবে? যা হবার তো হয়েই গেল... দুজনের রাস্তা দু-রকম হয়ে গেল, অথচ জীবনটা অন্যভাবে বইতে পারত। কোথা থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া কেমন করে বদলে দিল ওদের জীবন... কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

নিষাদের বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরের একটা কারখানায় ভোঁ ভোঁ করে সিটি বেজে উঠল, বেলা দুটোর সিটি। কারখনার শ্রমিকদের একদিকে ছুটি, আবার দ্বিতীয় শিফটে কাজে যোগদানের সিটি। কারখানার দুপুরের সিটির আওয়াজ শুনলেই নিষাদের মনটা কেমন উদাস হয়ে পড়ে, এই সিটিই ওর জীবনে পরিবর্তনের একটা বড় অধ্যায় নিয়ে এসেছিল। একদিকে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই, অন্যদিকে পড়াশোনা—দুইয়ের মধ্যে তালমিল রাখতে রাখতে নাভিশ্বাস উঠত নিষাদের। তবুও হাল ছাড়ত না।

নিষাদের বাবার জীবিকা বলতে ছিল ওই কারখানার শ্রমিক আর দুপুরে অফিসারদের বাড়ি থেকে খাবার এনে কারখানার গেটে পৌঁছে দেওয়া। মাসে এক-একজন শ্রমিকের কাছ থেকে সেটা বাবদ বাবার মজুরি ছিল ১০ টাকা। সকাল ১০টা নাগাদ বাবা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। শ্রমিকদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে সাইকেলের বেল, বাড়ির মহিলারা একটা থলির মধ্যে খাবারগুলো টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে ওর বাবার হাতে দিতেন। সেটা সাইকেলে নানাভাবে ঝুলিয়ে রাখার এক অদ্ভুত কৌশল ছিল নিষাদের বাবার। এভাবেই একের পর এক বাড়ির বিভিন্ন জাতি, ভাষাভাষী শ্রমিকের নানা রকম খাবার সাইকেলে ঝোলাতে ঝোলাতে এক সময় গোটা সাইকেলটা ঢাকা পড়ে যেত। এখন মাঝে মাঝে জাতিগত অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে নিষাদের কিন্তু একটা বিষয় বড় অবাক লাগে, কই ওই সময় তো একই সাইকেলে কত জাতি, ধর্মের খাবার বহন করে নিয়ে যেতেন তার বাবা। কিন্তু এ নিয়ে তো কোনো দিনও কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার সামনে পড়তে হয়নি তার বাবাকে? তাহলে কি শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে পেশাগত ঐক্যই এর কারণ? যাই হোক, এই অসহিষ্ণুতা ছিল না বলেই নিষাদের পরিবারটা সেদিন টিকে গিয়েছিল। এরপর অদ্ভুত কৌশলে নিষাদের বাবা সাইকেলে চেপে হাজির হতেন ঠিক দুটোর সময় কারখানার গেটে ভোঁ বাজার সাথে সাথে। ওই গেট দিয়ে পঙ্গপালের মতো বেরিয়ে আসতেন শ্রমিকরা। নিষাদের বাবার মতো আরও অনেক টিফিনবাহক থাকতেন। সবারই থাকত নিজস্ব জায়গা। ওইখানে শ্রমিকরা দলে দলে বেরিয়ে আসতেন। অদ্ভুত কৌশলে প্রত্যেকের টিফিনের ব্যাগ চিনে চিনে বাবা ওদের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে আসতেন বাড়িতে। এটাই ছিল নিত্যদিনের কাজ। কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সাথে পড়তে গিয়ে নিষাদকে কথায় কথায় শুনতে হত তার বাবা-দাদাদের পেশার কথা। মনে মনে ভাবত, ''ইস, আমার বাবার যদি এরকম একটা পেশা থাকত কত ভালো হতো!'' কোনোদিন মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্য নিষাদ মন খুলে তার বাবার এই পেশার কথা বন্ধুদের বলতে পারত না।

এরকম সময়ে হঠাৎই পরিচয় হয়েছিল স্বাতীর সঙ্গে। নিষাদ ছিল সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। স্বাতী সবে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট একটাই—অর্থনীতি। ইন্টার কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিষয় ছিল 'বাঙালি জীবনে মধ্যবিত্ত মনের প্রভাব ক্ষতিকর'। নিষাদ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেকে উজাড় করে তুলে ধরেছিল এই বিতর্কসভায়—হয়েছিল প্রথম। স্বাতী দ্বিতীয়। তারপর থেকে পরিচয়, নানা বিষয়ে আলোচনা, ক্লাস-নোটের আদান-প্রদান। কখন যে ওরা নিজেরা নিজেদের পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছিল নিজেরাই জানে না। কলেজের বন্ধুরা অনেকেই জেনে গিয়েছিল। তবে এটাকে কেউ কোনো অস্বাভাবিকতা বলে মনেই করত না।

নিষাদের বাবা মাঝে মাঝে সকালে যখন টিফিন নিতে বার হতেন, নিষাদের মা-ই নিষাদকে বলত, ''যা, তোর বাবার সাথে একবার বাড়িগুলো চিনে নে। ভগবান না করুন তবুও মানুষের শরীরে তো জ্বরজ্বালা হতেই পারে, সে দিনটা যদি কামাই হয় খুবই বিপদ হবে। যা না বাবা, বাড়িগুলো চিনে রাখ, আর লোকগুলোকেও চিনে রাখ, যদি সেরকম...।'' আর কিছু মা বলত না, নিষাদ কোনো আপত্তি করেনি, বরাবরই মায়ের বাধ্য। যেত বাবার সাথে। সব বাড়ি চিনে রেখেছিল। শ্রমিকদেরও চিনত। বিশ্বকর্মা পুজোর কয়েক দিন আগে বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। এর মধ্যও বাবা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা পুজোর দিন অসম্ভব জ্বর আর মাথাব্যথা নিয়ে বাবা একদম শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। পাশের রাস্তার ধারে দত্তকাকুর ওষুধের দোকান, সেখানে একজন ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে নিষাদ। ১০ টাকা ভিজিট। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন। এদিকে আজকের টিফিন নিয়ে যেতে হবে। নিষাদ তাড়াতাড়ি করে বাবার সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি বাড়ি ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে সংগ্রহ করল টিফিন। অনেকেই জিজ্ঞাসা করল ওর বাবার সম্বন্ধে। ''শরীর খারাপ'' বলেই আবার এগিয়ে চলল টিফিন সংগ্রহে। কথা বলার সময় নেই যে। একটু পরে দুটোর ভোঁ বাজবে। আজ পুজো উপলক্ষ্যে কারখানা কেটে প্রবেশ অবাধ। ইচ্ছে ছিল টিফিনগুলো মজুরদের হাতে দেওয়ার পর কারখানাটা ঘুরে দেখবে। একজন টিফিন-বয়কে নিষাদ বলল, ''দাদা আমি আজ জেনারেল অফিসের কাছে থাকছি। কাকুরা এলে বলে দেবে আজ ওখানেই টিফিন নিয়ে নিতে।'' নিষাদ জেনারেল অফিসের পাশে বটগাছটার বাঁধানো ধারটাতে সাইকেল থামিয়ে টিফিনের

ব্যাগগুলো নামিয়ে রাখে। একে একে মজুররা এসে টিফিনগুলো নিয়ে নেয়।

কাজ সারা হতেই নিষাদ এবার কারখানা দেখার জন্য জেনারেল অফিসের কাছে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে এগোতেই চোখে পড়ল স্বাতী, ওর বোন আর দাদা জেনারেল অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে। ওকে স্বাতী আর তার বোন দুজনেই দেখতে পেল। মাঝে মাঝে স্বাতীর বোন স্বাতীর সাথে কলেজে আসত। স্বাতীর সাথে নিষাদের যে একটা সম্পর্ক আছে সেটাও ভালো ভাবে জানত স্বাতীর বোন। নিষাদকে দেখে স্বাতীর বোনই এগিয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার, নিষাদদা? তুমিও কি কারখানা দেখতে এসেছো? ভালোই হল।" এবার স্বাতীকে উদ্দেশ্য করে ওর বোন বলে উঠল, ''কী মজা হবে বল দিদি। চল আমরা সবাই একসাথে ঘুরে কারখানাটা দেখব। দাদা, আমাদের সাথে নিষাদদাও চলুক। ওকে বল না!" স্বাতীর দাদা এখানে এই কারখানারই একজন বড় অফিসার। ও অনেকদিন ধরেই জানে যে নিষাদের বাবা এখানের টিফিন-বয়। মজুরদের খাবার নিয়ে আসে। আর মাঝে মাঝে নিষাদও ওর বাবার সাথে আসে সবটা জেনে বুঝে নেবার জন্য। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে স্বাতীর দাদা বলে উঠল, ''ও তো এই কারখানার টিফিন-বয়, মজুরদের খাবার নিয়ে আসে। ওর বাবা প্রত্যেকদিন আসে, আজ বাবার বদলে খাবার নিয়ে এসেছে, ওকে বাড়ি ফিরতে হবে না? না-না, ও যাবে না।" এরপরই বোনকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলে, ''কী বলছিস? ওকে নিয়ে গেলে আমার সম্মান থাকবে? যত্ত সব।" এবার গটগট করে স্বাতীর দাদা পাশে রাখা গাড়িতে উঠে পড়ে, হাত ধরে টেনে ওদের গাড়িতে বসিয়ে নেয়। শুধু স্বাতী আর ওর বোন অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে নিষাদের দিকে। গাড়িটা একরাশ ধুলো ধোঁয়া নিষাদের দিকে উড়িয়ে এগিয়ে যায়। নিষাদ হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক করে, না আজ আর কারখানা দেখবে না। ফিরে চলে ওদের বাস্তির দিকে।

এই ঘটনার পর বাবার অসুস্থতার জন্য অনেকদিন কলেজ যেতে পারেনি নিষাদ। গেল একেবারে পুজোর ছুটির পর। ভেবেছিল স্বাতীর সাথে দেখা হবে, হয়নি। পরে স্বাতীর সহপাঠীদের কাছেই জানতে পারে স্বাতী এখান থেকে টি.সি. নিয়ে বাইরে কোথায় যেন পড়তে গিয়েছ। আর কলেজ আসবে না। তবু বহুবার নিষাদ চেষ্টা করেছে স্বাতীর বাড়ির কাছে গিয়ে খবর নেবার। কিন্তু কোনো খবরই যোগাড় করতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল বাড়ির দারোয়ানদের কাছে জানতে, দারোয়ান শুধু ওকে তাড়িয়েই দেয়নি, একদিন ওর দাদার নির্দেশে পাড়ার একজনকে দিয়ে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর পড়াশোনায় ডুবে যায় নিষাদ। ভালো রেজাল্ট করে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপনা—বিয়ে—সংসার। এখন আর কোনো সমস্যা নেই। ছেলেও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একটা বড় বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করে। বেশ সচ্ছল অবস্থা নিষাদের। এতদিন পর একটুকরো কালবৈশাখীর মতো হঠাৎই ৪২ বছর পর কোথা থেকে ওর জীবনে হাজির হল স্বাতী। যদিও এখন আর ফেরার রাস্তা কারোরই নেই। দুজনে ভিন্ন পথের যাত্রী। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিষাদ নিজের মনেই হেসে ফেলে। হাতের মধ্যমা দিয়ে পাগলের মতো কপালে দুটো টোকা দিয়ে বলে ওঠে, ''ওহে নিষাদ, এসব নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। যেমন আছো তেমনই থাকো। এই বেশ ভালো আছো, বাঁচতে চাও তো ভুলে যাও—সব ভুলে যাও।"

প্রিন্সিপ্যাল চেম্বার থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় আবার স্বাতীর ফোন। এদিন ওর গলাটা কেমন যেন ধরা ধরা, কথা বলতে বলতে গলাটা সামান্য কাঁপছিল স্বাতীর। নিষাদ প্রশ্ন করে, ''কী ব্যাপার তোমার শরীর খারাপ নাকি?" ওপার থেকে স্বাতী বলে, ''না, আসলে কয়েকদিন ধরে ঘুসঘুসে জ্বর আসছে। ওষুধ খাচ্ছি, সারছে না, সাথে কাশিটাও বড্ড জ্বালাচ্ছে।" উদ্বিগ্ন হয়ে নিষাদ ওকে পরামর্শ দেয়, ''ভালো ডাক্তার দেখাও, তোমাদের দিল্লিতে তো ডাক্তার-বদ্যির অভাব নেই। ভালো করে দেখিয়ে নেবে।" এরপরই আসল কথায় চলে যায় নিষাদ। প্রশ্ন করে, ''আচ্ছা স্বাতী সেই বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকে যে উবে গেলে একবারও যোগাযোগ করলে না? সত্যি করে বলবে কী হয়েছিল?" ওপার থেকে দমক দিয়ে কাশির শব্দ, ফোনটা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে, অভিমান ভরে স্বাতী বলে ওঠে, ''দেখো, নিজের দোষ ঢাকতে মিথ্যে কথা বলাটা কম কর। এতগুলো চিঠির একটাও জবাব না দিয়ে আমাকে দোষ দিচ্ছ? ঠিক আছে, আমারই দোষ ছিল। তবে শোনো, ওইদিন বাড়ি ফিরে দাদা বাবার সাথে কী আলোচনা করেছিল জানি না। তবে তার পরদিনই দাদা আমাকে নিয়ে সোজা কানপুরে বড় দিদির কাছে নিয়ে আসে। জামাইবাবু কানপুরে আইআইটি-র অধ্যাপক। এখানেই কোথা থেকে কী হল জানি না, দাদা আর বাবা দুজনে মিলে আমাকে কানপুরে একটা কলেজে ভর্তি করে দেয়। তারপর আমি তোমার সাথে নানাভাবে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছি। তখন তো আর এমন টেলিফোনের সুবিধা ছিল না। আর কানপুরে কে আমাকে তোমার খবর এনে দেবে? আমি কয়েক মাস ধরে অনেক চিঠি লিখেছি তোমার ঠিকানায়। কিন্তু একটারও উত্তর পাইনি। এরপর যা হয় তাই হল। পাশ করলাম। পিএইচডি করলাম। দিল্লির এই কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলাম। তারপর বাড়ির চাপে বিয়ে, সন্তান, বৈধব্য সবই হল—এটাই হল ইতিহাস। আর যখন তোমাকে খুঁজে পেলাম, তখন সব নাগালের বাইরে। হাতের কাছে, অথচ ধরা সম্ভব নয়। কেন এমনটা হল বলতে পার নিষাদ?" নিষাদ শুধু ফোনটা ধরে রাখে। কোনো উত্তর দিতে পারে না। শুধু বলে, ''রাখছি।" ওপার থেকে ফোন কেটে গেল। কেমন নেশাগ্রস্তের মতো নিষাদ বাড়িতে ফিরে আসে। ফোনটাকে নিজের শোবার ঘরে রেখে, জামাকাপড় বদলে ফেলে। বরাবরের অভ্যাস মতো এককাপ চা নিয়ে আসে সরমা, চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে নিষাদ নিজের স্টাডিরুমে বসে, টিভিটা চালিয়ে দেখতে শুরু করে। টিভিটা চলছিলই। টিভির দিকে তাকিয়ে থাকলেও যেন কিছুই দেখছিল না। শুধু একটা কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, স্বাতীর চিঠিগুলো কেন ওর হাতে এল না—কী হয়েছিল?

এদিকে কর্ণ ঘরে গুটি গুটি ঢুকে নিষাদকে অন্যমনস্ক দেখে ফোনটা নিয়ে বারান্দায় বসে বসে খেলতে থাকে, নিনি সেটা লক্ষ্য করে। কিন্তু আজ আর কর্ণকে কিছু বলে না। হঠাৎ নিনি শুনতে পায় নিষাদের গলা—ফোনটার কল রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা ছিল। নিষাদ শুধু ফোনই করত, কিন্তু সব কলই অটোমেটিক রেকর্ড হয়ে যেত সেদিকে নজর ছিল না নিষাদের। সব সেভ হয়ে থাকত ফোনে। কর্ণ খেলতে খেলতে আপন খেয়ালে কল রেকর্ডিং অপশানটা টিপে দেয় আর তাতে বাজতে থাকে আজকে নিষাদ আর স্বাতীর সব কথা। নিনি ছুটে এসে ফোনটা ছোঁ

মেরে কেড়ে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে প্রবেশ করে শুনতে থাকে সব কথা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনে, বার বার শোনে। এদিকে সরমা তখন নিচের বারান্দায় ছিল। নিষাদের জন্য চা জলখাবার হয়েছে কি না জানতে উপরে রান্নাঘরে উঁকি মেরে কাউকে দেখতে পায় না। দেখে গ্যাসের উনুনে আগুন জ্বলছে কিন্তু কড়াই চাপানো নেই, শুধু শুধু গ্যাস নষ্ট হচ্ছে দেখে ওভেনটা বন্ধ করে। নিনিকে খাবারের কথা বলতে গিয়েই ওর ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে, হঠাৎ নিষাদের গলা শুনতে পায়। নিষাদ যেন কোনো মহিলার সাথে কথা বলছে। পা টিপে টিপে নিনির ঘরে প্রবেশ করে। নিনি তখন এক মনে ফোনটার কল রেকর্ডার চালিয়ে নিষাদ আর স্বাতীর কথা শুনছে। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনছে। কোনোদিকে তাকানোর হুঁশ নেই। সবটা শোনার পর ফোনটা বন্ধ করে ফিরতেই সামনে দেখে সরমাকে। ''ফোনটা দাও।'' সরমা কোনোদিন নিনিকে এত কঠোর সুরে কথা বলেনি। কিন্তু আজ বলল। চাপা সুরে হিস্ হিস্ করে সরমা আবার বলে ওঠে—''ছিঃ ছিঃ, এই তোমার শিক্ষা? বড়দের ফোন নিয়ে গোয়েন্দাগিরি, কী করছ নিনি এসব? আমার স্বামী কার সাথে কী করছে, কী করছে না, আমি বুঝব, কিন্তু তুমি? এই জন্যই ফোনটা বদলে নতুন ফোন দিয়েছিলে?'' কঠোর ভর্ৎসনায় নিনি হাত তুলে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে কী যেন বলতে চেষ্টা করল। সরমা আরও কঠোর স্বরে বলে, ''থাক, ফোনটা দাও।'' সরমা ফোনটা নিয়ে নিষাদের ঘরে এসে ফোনটা নিষাদকে দিয়ে বলে, ''সব সময় ফোন যেখানে সেখানে ফেলে রাখ আর কর্ণ নিয়ে খেলা করে। কোনোদিন খারাপ হয়ে যাবে তখন বুঝবে।'' নিষাদের উত্তর, ''কী আর বুঝব? আমারটা তো আছে, ওটাতেই কাজ চলবে। ''ঝাঁঝিয়ে ওঠে সরমা, ''তাই চালাচ্ছো না কেন? এতবড় ঢাউস ফোনে তোমার কী দরকার? বদলে নাও ওটা।'' নিষাদ বলে ওঠে, ''আসলে ছেলে বৌমার দেওয়া ফোন ওদের মন রাখতে ব্যবহার করি। নইলে এতবড় ফোনে আমার খুবই অসুবিধা হয়। কী করব বল?'' অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে সরমা, কী আর বলবে? রেগে ঘর থেকে বের হতে হতে বলে যায়, ''যা ইচ্ছে তাই কর।''

কিছুক্ষণ বাদে আবার ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা ধরেই কাশির দমকেই বুঝতে পারে স্বাতী ফোন করেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ''এই তো আধঘন্টা আগে কথা হল, আবার কী দরকার পড়ল?'' ওপার থেকে স্বাতীর উত্তর, ''আমার শরীরটা তো ভালো যাচ্ছে না। তোমার সাথে অনেক কথা আছে। একবার আসতে পারবে?'' নিষাদ প্রশ্ন করে, ''দিল্লি?'' ''হ্যাঁ—'' বলেই স্বাতী বলে উঠল, ''একলা আসতে না পারলে তোমার বৌকে নিয়ে আসবে। ও যদি জানে তো জানুক না, কোনো ক্ষতি তো নেই? আর আমরা তো কোনো পাপ করিনি। এই যেমন ধর বিয়ের আগে আমি কিন্তু অয়নকে সব বলেছিলাম, সব শুনেও রাজি হয়েছিল বিয়ে করতে। এখন যাজ্ঞ্য বড় হয়েছে, চাকরি করে, কয়েক দিন পরেই ওরা বিয়ে করবে। মেয়েটি খুবই ভালো। আমি ওদেরও সব কথা বলেছি। তোমার কথা আমার কথা সব। তাই তোমার বৌকে নিয়ে আসলে অসুবিধা কোথায়?'' খানিকটা দোটানায় পড়ে নিষাদ কী করবে বুঝতে পারে না। ওদিক থেকে আবার আবদারের সুরে স্বাতী বলে ওঠে, ''আনো না।'' নিষাদ দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বলে, ''ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।'' ''দেখ দেখ ভালো করে ভেবে দেখ,'' শুধু এটুকুই বলে ফোন রেখে দেয় স্বাতী।

রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছে না, শুয়ে শুয়েই এপাশ ওপাশ করছে নিষাদ। ইদানীং ওরা একই ঘরে ঘুমোলেও সুরমার আর নিষাদের আলাদা আলাদা বিছানা। নিশানের বিয়ে হওয়ার পর থেকেই এক বিছানায় শোয়া ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। তাতে অবশ্য আপত্তি করেনি সুরমা। বরং এতে নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করে। সরমার আবার শোয়ার পর বেশ খানিকটা সময় বই পড়ার অভ্যাস, কিন্তু নিষাদ শোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। সরমা বইটা একপাশে রেখে উঠে আসে নিষাদের কাছে। প্রশ্ন করে, ''কী, ঘুম আসছে না?'' ''না।'' বলেই নিষাদ সরমাকে প্রশ্ন করে, ''আচ্ছা সরমা, যদি এরকম হতো, ঠিক সিনেমার মতো, ধর আমাদের বিয়ের পর কয়েক দশক পর আমি জানতে পারলাম তোমার কোনো প্রেমিক আছে! তখন তোমার আর তার আলাদা আলাদা সংসার অথচ তার সাথে তোমার এখনো যোগাযোগ আছে। আমি কেমনভাবে নিতাম বিষয়টা?'' ''এসব পাগলাটে প্রশ্নের জবাব দিতে আমার দায় পড়েছে। ঘুমোও তো—'' বলেই সরমা নিজের বিছানায় যেতে উদ্যত হয়। বাধা দেয় নিষাদ। সরমার হাতটা চেপে ধরে আবার বলে ওঠে, ''যদি এমনটা আমার ক্ষেত্রে হত তুমি কেমনভাবে নিতে?'' পাল্টা সরমার উত্তর, ''দেখ এত বছর ধরে এভাবে কখনোই কোনো বিষয় লুকোনো যায় না, লুকোনো থাকতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর কেউ না কেউ বলবেই অথবা জানবেই—এটাই নিয়ম।'' ''যদি না বলে?'' প্রশ্ন করে নিষাদ। ''ছাড়ো তো ওসব কথা—তবে শুনে রাখ, বলবেই।'' ঘুমোতে চেষ্টা করে নিষাদ। নিষাদ ঠিক করে কাল যে করেই হোক বিষয়টা সরমাকে জানাবেই।

নানা কাজের চাপে সেটা আর হয়ে ওঠেনি। মাস দুয়েক আগে ওদিক থেকেও আর কোনো ফোন আসেনি। নিষাদেরও আর ফোন করা হয়ে ওঠেনি। পরীক্ষার কাজ, ছাত্রদের খাতা দেখা—এসবের মধ্যেই ডুবে ছিল। সেদিন সকালে বৌমা, ছেলে, সরমা, নিষাদ, কর্ণ সবাই একসাথে চায়ের টেবিলে বসে। একসঙ্গে সকালের চা খাওয়াটা ওদের পরিবারের দস্তুর। যখন ওরা দুজন ছিল তখন থেকেই এটা চালু, এখন ওরা পাঁচজন। এই ব্যবস্থা এখনো বজায় আছে।

চা খেতে খেতে ওরা সংসারের টুকিটাকি কথা বলছে। এদিকে কর্ণ আবার নিষাদের ফোনটা নিয়ে খেলা করতে শুরু করেছে। নিনি চোখ পাকিয়ে কর্ণকে ধমক দিয়ে ফোনটা ফেরত দিতে বলে। কর্ণ ফোনটা নিষাদকে দেবার আগেই রিং হতে থাকে। ফোনটা ধরে নিনি। ওদিক থেকে 'হ্যালো' বলেই এক পুরুষ কণ্ঠ নিষাদের খোঁজ করে। ''এক সেকেন্ড ধরুন—'' বলেই নিনি নিষাদের দিকে ফোনটা এগিয়ে দেয়। ''মেসোমশাই আমি যাজ্ঞ্য বলছি, মায়ের শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। মা আপনার খোঁজ করছেন, আপনি যদি একবার এখানে আসতে পারেন তো ভালো হয়।'' উৎকণ্ঠিত ভাবে নিষাদ প্রশ্ন করে, ''কেন কী হয়েছে স্বাতীর? কেমন আছে? তোমার মা কেমন আছেন যাজ্ঞ্য?'' যাজ্ঞ্য উত্তর দেয়, ''ভালো না, কতদূর কী হবে বুঝতে পারছি না। আসলে মা গোপনে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। আমাকেও কিছু জানাননি। বেশ কিছুদিন ধরেই দেখছি সব ব্যাপারেই মা কেমন রিলাকট্যান্ট হয়ে পড়েছিলেন—সেদিন ক্লাসে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যান। ওঁর ছাত্রছাত্রীরাই

হাসপাতালে নিয়ে আসে। এখানে ডাক্তারের কাছে জানতে পারলাম সমস্ত লাংটা সাংঘাতিকভাবে কার্শিনামো অ্যাফেক্টেড। ডাক্তারবাবুরা বলছেন হয়তো যে-কোনো দিন কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। সেই থেকে মা হাসপাতালে। যদি একটিবার আসতে পারেন খুবই ভালো হয়।"

সরমা নিষাদকে প্রশ্ন করে, ''কে ফোন করছে?" নিষাদ বলে, ''আমার এক পরিচিতার ছেলে। ওর মায়ের খুব শরীর খারাপ। একবার সম্ভব হলে দিল্লি যেতে বলছে। কিন্তু যাব কী করে? একলা যাওয়া সম্ভব নয়। যা হবে হোকগে।" —একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিষাদ উঠে যায়। অবাক করার কথা, যে সরমা কোনোদিন বাইরে যেতে চায় না, যেন খানিকটা আদেশের সুরেই বলল নিশানকে, ''এই নিশান তুই দেখ তো আজকের ফ্লাইটে দিল্লির কোনো টিকিট পাওয়া যায় কিনা। আমি আর তোর বাবা দিল্লি যাবো।" নিনির দিক তাকিয়ে সরমার প্রশ্ন, ''যাবে? চল না—" যেন বলতে চায়, ''আর চুপি চুপি ফোন রেকর্ডিং শুনে কী করবে, চল দেখেই আসি কী ব্যাপার।" খানিকটা নিমরাজি হলেও নিনি রাজি হয়ে যায়। এবার নিষাদের ফোনটা নিয়ে সরমা নিজেই ফোন করে যাজ্ঞ্যকে। ওপার থেকে কষ্ট করেও ফোন ধরে স্বাতী, সরমা বুঝতে পারে স্বাতী ফোন ধরেছে, সরমা ওকে বলে ওঠে—''আমি সরমা—নিষাদের স্ত্রী বলছি, তুমি চিন্তা কোরো না, আমরা যাচ্ছি। আজ বিকেলেই যাচ্ছি। রাত্রি নটা নাগাদ তোমার সাথে দেখা হবে। তোমার ছেলেকে দাও। নিষাদ ওর সাথে কথা বলবে।" সরমার ইন্টারফেয়ারেন্সে সবটা এত দ্রুত ঘটে গেল, নিষাদের আলাদা করে ভাবনা চিন্তার সময় ছিল না। নিষাদ এরপর কখন কীভাবে যাবে সবটা জানিয়ে দেয় যাজ্ঞ্যকে।

এয়ারপোর্ট থেকে ওরা বের হতেই সামনেই দেখতে পেল এক সুবেশ যুবক, নিশানেরই সমবয়সী হবে। 'ড. নিষাদ রায়' নাম লেখা হাতে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিষাদকে আগেই দেখেছিল যাজ্ঞ্য। চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি। এগিয়ে এসে নিষাদ আর সরমাকে প্রণাম করে ওদের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালের দিকে চলে। হাসপাতালের সামনে স্বাতীর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ওরা নিজেরাই ফিস ফিস করে আলোচনা করছিল নিষাদকে নিয়ে, তা বেশ বুঝতে পারল নিষাদ। যাজ্ঞ্য সোজা নিষাদ আর অন্য সবাইকে নিয়ে হাজির হল স্বাতীর বেডের কাছে। ওর মাথায় হাত বোলাতে বালাতে সরমা বলে উঠল—''বোন, তেমার চিঠি নিষাদ কেন পায়নি তার জন্য দায়ি নিষাদ নয়।" চমকে ওঠে নিষাদ। সরমা কী করে এসব জানল? অবাক হয়ে নিষাদই প্রশ্ন করে, ''এসব তুমি কী করে জানলে?" সবাই শুনছে, স্বাতীও শুনছে সরমার কথা—''আমাদের বিয়ের তখন ১৫ বছর হয়েছে, নিশানের বয়স তখন বারো, একদিন আমার শাশুড়ি মা আমাকে একলা পেয়ে দুপুরবেলাতে সব কথা জানান এবং এও বলেন যে আমার শ্বশুরমশাইকে একদিন সারারাত গুণ্ডা দিয়ে স্বাতীর দাদা আটকে রেখে তারপর ছেড়েছিল এই হুমকি দিয়ে—''খবরদার ছেলেকে সাবধান করে দিবি। সান্যাল সাহেবের বোনোর সাথে যেন তোর ছেলে আর কোনো যোগাযোগ না রাখে।"

নিষাদের মনে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা। সেদিন সারা রাত বাবা বাড়ি আসেননি। সকালে যখন এলেন তখন চোখেমুখে অনেক ক্ষত। বাবা শুধু বলেছিলেন, রাস্তাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এ নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামায়নি নিষাদ। বাবার চিকিৎসাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বাবা কিন্তু ওকে কিছুই বলেন না।

এদিকে সরমা বলে চলেছে, ''তারপর অনেকগুলো চিঠি এসেছিল তোমার। সবগুলোই খুলে পড়েন শাশুড়ি-মা। কিন্তু আর ওগুলো নিষাদের হাতে দেননি। সব নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। সেদিনই শাশুড়ি মা আমাকে সব জানান, চিঠিগুলোও আমাকে দিয়ে বলেন, ''তুমি আমাকে কথা দাও বৌমা, নিষাদ যতদিন তোমার কাছে এ-সম্বন্ধে কিছু না বলবে তুমি নিজে থেকে কিছু জানাতে চাইবে না। আমি জানাতেও চাইনি। কিন্তু সেদিন নিনি যখন ফোনের কল রেকর্ডিং শুনছিল তখন আমি ঠিক করেছিলাম এই চিঠির লেখককে সুযোগ পেলেই আবার চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে বলব, বোন, তুমি এগুলো আবার নিজের হাতে প্রাপককে ফেরত দাও।"

ধরা গলায় সরমা বলে ওঠে, ''সুযোগ পেলাম কিন্তু..." প্রচণ্ড আবেগে আর কথা বলতে পারল না সরমা। চোখ মুছে হ্যান্ডব্যাগ থেকে একগোছা চিঠি বার করে সরমা স্বাতীর হাতে ধরিয়ে দিল। চিঠিগুলো অনেকক্ষণ ধরে বুকে চেপে রাখল স্বাতী। ধীরে ধীরে তুলে দিল নিষাদের হাতে। চমক ভাঙল অয়নের আওয়াজে, ''চলুন, আপনারা অনেকটা জার্নি করে এসেছেন। একটু চা খেয়ে নেবেন, ফ্রেস হয়ে নেবেন।

ইচ্ছে করেই স্বাতী আর নিষাদকে খানিকটা একলা থাকার সুযোগ করে দেবার জন্য যাজ্ঞ্যর হবু স্ত্রী বলে উঠল, ''মেসোমশাই থাকুন, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনার চা-টা না হয় আমি এখানেই এনে দিচ্ছি। নিনিও এই কথায় সায় দিল। ওরা সবাই বেরিয়ে গেল।

নিষাদ চিঠিগুলো পাঞ্জাবির পকেটে পুরে মুঠো করে ধরে আছে। অপলক নজরে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলল, ''কেন এমন হল?" স্বাতীর উত্তর নেই, স্বাতীর চোখদুটো খোলা, যেন দেখছে নিষাদকে। প্রথমটা নিষাদ বুঝতে পারেনি কী হল। যাজ্ঞ্যর হবু স্ত্রী কিরণ এই হাসপাতালেরই ডাক্তার, ইতিমধ্যে চা নিয়ে এসে কাপটা পাশে রেখে যা বোঝার সবটা বুঝে ফেলেছে। একটা হাত নিষাদের কাঁধে রেখে শক্ত করে চেপে ধরল, আর ডান হাতটা দিয়ে স্বাতীর চোখ দুটো বন্ধ করে দিল। কিরণের পিছন পিছন কখন সাথে খাবার নিয়ে আসা টিফিন-বয়টাও হাতে প্লেটটা নিয়ে থ-মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

নিষাদ যেন কিছু বুঝতে পারে না। বড্ড গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।—কিন্তু এ কী? কী দেখছে সব! সামনে তো স্বাতী নেই! কিন্তু এতগুলো টিফিনবাক্স চারিদিকে নামানো কেন? আর ওই তো স্বাতী যেন হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকছে! কিন্তু কিসের টানে যেন স্বাতী আর এগোতে পারছে না। কেউ যেন হিড় হিড় করে স্বাতীকে টেনে একটা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে একরাশ ধোঁয়া ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। একটা হাত বাড়িয়ে নিষাদ কী যেন ধরতে চায়। কিন্তু নিজের কাঁধে হাল্কা চাপ অনুভব করে নিষাদ ফিরে আসে বাস্তবের মাটিতে। বেশ বুঝতে পারে ওকে ধীরে ধীর নিনি আর কিরণ লিফ্টে করে নিচে নামিয়ে আনছে আর লিফটের সামনেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সরমা—লিফট থামতেই হাত বাড়িয়ে দেয় নিষাদের দিকে।

ভ্র ম ণ

চলতে চলতে কেদারকাঁটায়

বিলাস চ্যাটার্জি

গাড়োয়াল হিমালয়ের তমসা উপত্যকা ট্রেকারদের জন্য স্বর্গরাজ্য। এই অঞ্চলে ছোটো বড়ো অনেকগুলি ট্রেকিং রুট আছে। সারা বছর ট্রেকারদের যাতায়াত প্রায় লেগেই থাকে। বড ট্রেক নয়, এখন এই অঞ্চলেরই একটা ছোট্ট অথচ সুন্দর ট্রেকিং পথের কথা বলব।

তমসা নদীর উৎপত্তি হয়েছে নেটওয়ার নামক একটি জায়গায়। রুপিন ও সুপিন দুটি নদী মিলিত হয়েছে নেটওয়ারে। এই দুটি নদীর মিলিত ধারায় তমসার উৎপত্তি। রুপিন ও সুপিন নদী-দুটি আবার বেশ কয়েকটা উপনদীর দ্বারা পুষ্ট। এইসব ছোটো-বড়ো নদীগুলির চারপাশেই আছে গাড়োয়াল হিমালয়ের নামি অনামি অনেক ট্রেকিং পথ। আর এই অঞ্চলটিই হল তমসা উপত্যকা। আজ কেদারকাঁটা যাত্রার কথা বলব, যা এই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় ট্রেক রুট।

মাত্র চার দিনের হাঁটাপথে এই সুন্দর জায়গাটি ঘুরে আসা যায়, তা-ও ইচ্ছে হলে সপরিবারে। এই পথে সারা বছর ট্রেকাররা গিয়ে থাকে। শীতকালে তুষারপাত হলেও ট্রেকারদের যাতায়াত অব্যাহত থাকে, তার কারণ হল এর উচ্চতা—মাত্র সাড়ে বারো হাজার ফুট।

প্রথম দিন : উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার একটি সুন্দর জনপদ শাঁকরি। এখান থেকেই ট্রেকিং শুরু হয়। দেরাদুন সহ বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে শাঁকরি পর্যন্ত বাস চলাচল করে। এখানে জিএমভিএন-এর একটি গেস্ট হাউস, বন দপ্তরের বাংলো ছাড়াও কয়েকটা প্রাইভেট হোটেল আছে থাকার জন্য। খাবারের হোটেল, স্টেশনারি, মুদিখানা, কাঁচা সবজি সহ ওষুধের দোকানও আছে এই জনপদে। এইসব কিছুকে ছাপিয়ে রয়েছে সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা।

সামনের পাকা রাস্তা চলেছে হরকিদুনের পথে। এই পথে তালুকা পর্যন্ত গাড়ি চলে। সেই পথেই এগিয়ে চলা। বনবিভাগের চেকপোস্ট পড়বে যাত্রার শুরুতেই। পথের দুইধারে বড় বড় সুন্দর গাছ। ডানদিকে ওয়াই.এইচ.এ.আই-এর ক্যাম্প। সেখানে বেসক্যাম্প করে ওয়াই.এইচ.এ.আই-এর হরকিদুন ও কেদারকাঁটা ট্রেকিং হয়ে থাকে মার্চ-এপ্রিল মাসে। আর কিছুটা এগিয়ে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা গ্রামের পাশ দিয়ে চড়াই বেয়ে উঠে চলা। গ্রামটির নাম সরধার। গ্রাম শেষ হতেই জঙ্গলপথের শুরু। চড়াই ক্রমশ আরও কঠিন হতে থাকে। জঙ্গলও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যায়। ঘন্টাখানেক হাঁটার পর একটা ছোট্ট বুগিয়ালে উঠে এসে কিছুটা জিরিয়ে নেওয়া যায়। বুগিয়ালটির নাম জয়নল বুগিয়াল।

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা। জঙ্গলপথে কঠিন চড়াই বেয়ে এগিয়ে চলা। এই পথের মাঝে ছোটো ছোটো বুগিয়ালগুলো শরীর ও মনের ক্লান্তিকে দূর করে। পরপর জয়নল পেরিয়ে ধারখোরা কোয়ামহলী বুগিয়াল। এদের মধ্যে কোয়ামহলী বুগিয়ালটি একটু বড়। এখানে দুটি গোট আছে। গবাদি পশু পালনের জন্য সপরিবারে অস্থায়ী থাকার জায়গাকেই গোট বলে। প্রবল শীতে তারা আবার নিচে নিজেদের গ্রামে নেমে যায়। এই বুগিয়ালেই বেশ কিছু তাঁবু খাটানো আছে। একটা কোম্পানি যারা এই পথে ট্রেকারদের নিয়ে যায় তারা এই তাঁবুগুলো খাটিয়ে রেখেছে। ওদের কাছে এক কাপ করে চা খেয়ে আবার এগিয়ে চলা। সুন্দরের সন্ধানে ক্লান্তিহীন একটা যাত্রা। হঠাৎই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। বৃষ্টি শুরু হতেই আর দেরি না করে এগিয়ে চলি সেদিনের গন্তব্য জুরাতাল-এ। প্রায় ৪ ঘন্টা হেঁটে জুরাতালে পৌঁছোনো মাত্রই মুষলধারায় শুরু হল বৃষ্টি। আমাদের তাঁবু খাটানো থাকায় তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে ভেতর থেকে জঙ্গলের বৃষ্টিকে উপভোগ করা গেল।

ঘন্টাখানেক মুষলধারায় বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হল। রোদ ওঠা মাত্রই প্রকৃতি অন্য রূপে সেজে ধরা দিল। বৃষ্টির পর চায়ের আমেজটুকু নষ্ট না করে বাইরে বের হলাম। জঙ্গলে ঘেরা লম্বা বুগিয়াল 'জুরা'। এক পাশে একটা ছোট্ট তালাও বা জলাশয় আছে। ক্যাম্প করার আদর্শ জায়গা এই জুরাতাল। সন্ধ্যে নামা পর্যন্ত বাইরে ঘোরাফেরা করলে বেশ ভালোই লাগবে।

দ্বিতীয় দিন : লক্ষ্য বেস ক্যাম্প। কেদারকাঁটার বেস, যেখান থেকে কেদারকাঁটা উঠে আবার নেমে আসা যায়। দূরত্ব মাত্র আড়াই

কিমি। প্রাতরাশ সেরে চারিদিক আরও একবার ঘুরে একটু দেরিতে যাত্রা শুরু হল। ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা।

গতদিনের মতোই কঠিন চাড়াই বেয়ে উঠে চলা। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। কিছুটা উঠে এসে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দূরে বরফে ঢাকা শৃঙ্গ চোখে পড়ে। সবুজ বনানীর মাঝে এই শ্বেতশুভ্র তুষারশৃঙ্গ মনে আনন্দ এনে দেয়। পথের ক্লান্তি ভুলে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিছুটা এগিয়েই একটা ছোট্ট বুগিয়াল, নাম ঘিউওধারী। বুগিয়ালটিকে সবুজ গালিচার মতো ঘিরে রয়েছে কচি ঘাসেরা। আরো খানিক এগিয়ে উপরে উঠে তালখেত বুগিয়াল। সেখানে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পালা। ধীর পায়ে আরও খানিকটা উপরে উঠে পৌঁছানো গেল মুনাইলা বুগিয়াল। প্রশস্ত সেই বুগিয়ালেও একটা গোট চোখে পড়ে। এখান থেকে বেসক্যাম্প আরও কিছুটা উপরে। কিন্তু জুন মাসে উপরে জলের বড় অভাব। তাই আর উপরে না উঠে এখানেই তাঁবু খাটানো হল।

পরপর যতগুলি বুগিয়াল পেরিয়ে এলাম তাদের মধ্যে এই মুনাইলা বুগিয়ালটিই দৈর্ঘ্য-প্রস্থে অনেকটা বড়। ওপর থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেকটা। ১১টায় পৌঁছে চা খেয়েই ঘুরতে বেরিয়ে পড়া গেল। বেশ খানিকটা গিয়ে দেখি বছর ১০-১২-র কয়েকটা ছেলে এগিয়ে আসছে। এরা জঙ্গলের ভেতরেই কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। জন্তু-জানোয়ারের ভয় এদের নেই। ডেকে নিয়ে ফটো তোলার পর্ব চলল। তারপর চারপাশটা ঘুরে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে জঙ্গলের ধারে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম।

আমাদের দলে একজন ডাক্তার আছে জেনে আশপাশের জঙ্গলের গোট থেকে কয়েকজন উপস্থিত হল। ডাক্তারবাবু সেই সময় দূরে জঙ্গলে ঘুরতে যাওয়ায় ওদের সঙ্গে বসে গল্পের ছলে ওদের জীবনযাত্রার বৃত্তান্ত জেনে নেওয়া হল। এরা বেশ কয়েকটি পরিবার আশপাশেই জঙ্গলের ভেতর অস্থায়ী শিবিরে বাস করে। এরা জঙ্গলে আসে গরমকালে আর শীত এলে সবাই নেমে যায়। নিচে গ্রামে তাদের আসল ঘরবাড়ি। কৃষিকাজ আর পশুপালন তাদের জীবিকা। এরা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। অত্যন্ত কায়িক পরিশ্রমের মধ্যেও রোজা রাখতে হয়। রাত আড়াইটায় উঠে রান্না করে ভোর চারটেয় খাওয়াদাওয়া করে। কাজ তাদের অফুরন্ত। পাহাড়ে সূর্যোদয় যেমন তাড়াতাড়ি হয়, সূর্যাস্ত হয় দেরিতে। তাই সারাদিন না খেয়ে এই পরিশ্রম খুবই কষ্টসাধ্য।

অবশেষে ডাক্তার মজুমদার এসে রোগী দেখে ওষুধ দেন। সন্ধে নামতেই তাঁবুতে বসে রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া হল।

তৃতীয় দিন : যাত্রা শুরু হল সাড়ে-ছটায়। রুটি, সবজি কিছুটা খেয়ে আর বাকিটুকু সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু হল। মনাইলা বুগিয়াল শেষ হলে জঙ্গলের পথে কিছুটা এগিয়ে একটা ছোটো বুগিয়াল, নাম বুজুলা বুগিয়াল। এই বুগিয়াল দুটি ধাপে বিভক্ত। মুনাইলা পরিবারের গবাদি এখানেই ছাড়া আছে। মোষ চড়ে বেড়াচ্ছে। পরিবারের লোক

সকালেই এখানে চলে এসেছে। দুধ দুইয়ে, সেই দুধ নিচে শাঁকরি, মৌরী, নেটওয়ারে বিক্রি করে আবার তারা বিকেলে ফিসে আসবে। একজনই প্রায় ৪০ লিটার দুধ বড় বড় জ্যারিকেনে করে নিয়ে যায় পিঠে করে। প্রতিদিনের রুটিনে এই কাজ করে যুবকরা। মহিলারা বাড়ির কাজ ও পশুদের দেখভালের কাজ করে। ছোটোরাও ব্যস্ত। তারাও জ্বালানির কাঠ, জল সংগ্রহ সহ নানা কাজ নিরলসভাবে করে চলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

আমরা এগিয়ে চলি সামনে চড়াই বেয়ে। ক্রমশ জঙ্গলের ঘনত্ব কমতে থাকে। দূর থেকে কেদারকাঁটা দেখা যায়। মুরুন্ডা বুগিয়াল পেরিয়ে বঁইয়া বুগিয়ালে পৌঁছাই সাড়ে-আটটা নাগাদ। এই বুগিয়ালটা অনেক প্রশস্ত ও বিস্তৃত হলেও বড় গাছ এখানে নেই। ফলে দূরের পাহাড়চূড়াগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। হরকিদুন নালার পাড়ে সীমা, ওসালা গ্রামের রূপ পরিষ্কার দেখা যায়।

পাহাড়ের গা বেয়ে বঁইয়া পার হয়ে এবার কঠিন চড়াই বেয়ে উঠতে হবে কেদারকাঁটায়। অনেকটা এগিয়ে একটি গিরিশিরা ধরে উঠে চলি কাঁটার দিকে। এমন কঠিন চড়াই বেয়ে উঠতে বেশ দমের ঘাটতি হয়। বারে বারে বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চলি। ১০টা নাগাদ পৌঁছাই কেদারকাঁটায়।

কেদারকাঁটা যেন একটা পাহাড়ের ছাদ। ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্য ও বেশ কয়েকটি শৃঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়। সামনে হরকিদুন, পিছনে পুরলা শহর। প্রকৃতির পুজো শেষ করে শুরু হয় ফটোশেসন। তবে মন-ক্যামেরায় বন্দি সেই দৃশ্য যন্ত্রে পুরোপুরি ধরা পড়ে না। যা দেখলাম তা আজন্ম স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবে।

১১টা বাজল। এবার নেমে আসার পালা। বঁইয়া বুগিয়ালে ফিরে এসে একটু বিশ্রামের ফাঁকে কিছু খাওয়া হল। বুগিয়ালটি ছেয়ে আছে হলুদ, সাদা ছোটো ছোটো ফুলে। যাওয়ার সময় এখানে দাঁড়ানোর সময় ছিল না। এখন হাতে অনেক সময়। তাই মন ভরে প্রকৃতির অপার রূপ আস্বাদন করার পালা। নামতে বেশি সময় লাগবে না। তাড়া নেই সে-কারণেই। প্রকৃতির এই রূপ দেখেও যেন মন তৃপ্ত হয় না। আরও অনেকক্ষণ এই রূপকে দেখে যেতে মন চায়। ধীর গতিতে বেলা ১২টায় ক্যাম্পে ফিসে আসা হল। বাকি দিনটা কাটল শুয়ে-বসে গল্প করেই।

চতুর্থ দিন : দিনটা শুরু হল ডাক্তারবাবুর রোগী দেখা দিয়ে। তখনও আমরা টেন্ট থেকে বের হইনি। দুই মহিলা টেন্টের বাইরে অপেক্ষা করছে। একজনের গতকালই সন্তান হয়েছে। কোমর ও পায়ে ব্যথা বলে তাদের ওষুধ চাই। একটু সুস্থ হলেই ওদের কাজ করতে হবে। বিশ্রামের জো নেই ওদের।

সাড়ে-আটটা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়ি। আজকের পথ প্রায় সবটাই উৎরাই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে রাস্তা দু-ভাগ হল। ডানদিকে পথ দিয়ে আমরা এসেছিলাম। ওটা জুড়াতালাওয়ের পথ। এখন চলেছি বাঁ-দিকের পথে। একটু এগিয়েই পৌঁছাই তালক্ষেত্র। একটু বড় এই বুগিয়াল, একটি পরিবারের বাস। আমরা আর না দাঁড়িয়ে বুগিয়ালের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলি। আবার জঙ্গল। এই গভীর জঙ্গলের ভিতর আরও দুটি বুগিয়াল পার হলেই হরগাও ও কোপরা। হরগাও বুগিয়ালটি বেশ সুন্দর। চারিদিকে জঙ্গল ঘেরা দুটি ধাপে বিভক্ত। সবুজ ঘাসে ঢাকা বুগিয়ালে একটা গাছের তলায় বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিই। সব ক্লান্তি মুছে যায়।

এক সময় জঙ্গল শেষ হতেই গ্রামের পথে পা বাড়ানো। মূল গ্রামটি অনেকটা নিচে। এটি হল বাগিচা। এই জায়গাটির নাম জোরশালা বাগিচা। চারিদিকে বড় বড় আপেলের বাগান। মাঝে একটি করে বাড়ি। এখানেই গ্রামের লোকেদের গরু-মোষ থাকে। আমাদের গাইড বাবুরামের পরিবারের একটি বাগিচা আছে। সেখানে চা পানের আমন্ত্রণ পেলাম। আমরা গেলাম ওর বাগিচা-বাড়িতে। বাবুরামের স্ত্রী আমাদের দই, মাখন ও দুধ খাওয়ালো। আমরা যার যা পছন্দ খেয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। এবার আড়াআড়িভাবে শর্টকাট পথে হেঁটে কখনও জমির আল ধরে নেমে চলি। সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছাই শাঁকারির জি.এম.ভি.এন-এর বাংলোয়। সেখনেই শেষ হল এই পদযাত্রার।

With best compliments of

SUPARNA TRADING

CONTRACTOR & EARTHMOVERS

REGD. OFFICE : 2/18, Derojio Path, SAIL Co-Operative
City Centre, Durgapur-713216, Phone : (0343) 2566021

CITY OFFICE : Urvashi Commercial Centre, 1st Floor, Unit No. 017
Bengal Ambuja Housing Dev. Ltd., City Centre, Durgapur-713216
Mobile : 93337 46254

Sl. No. 172

Happy Pooja Greetings From

M&D TRADERS

GOVT. ELECTRICAL & INSTUMENTS CONTRACTOR
& GENERAL ORDER SUPPLIERS
Govt. Electrical Licence No. 10241

Gopinathpur, Durgapur-713219 Mobile : 9434388056, 9474698366, 9434647573
E-mail : ashokghosh_dgp@rediffmail.com

Sl. No. 169

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দেনুড় গ্রাম পঞ্চায়েত

মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি ।। দেনুড়, পূর্ব বর্ধমান, E-mail : denurgp@gmail.com
নির্মল গ্রামগুলিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট

কৃষ্ণারানি ঘোষ	সেখ আবদুর রসিদ	তরুণকুমার সাহা
উপপ্রধান	*সচিব*	*প্রধান*

Sl. No. 171

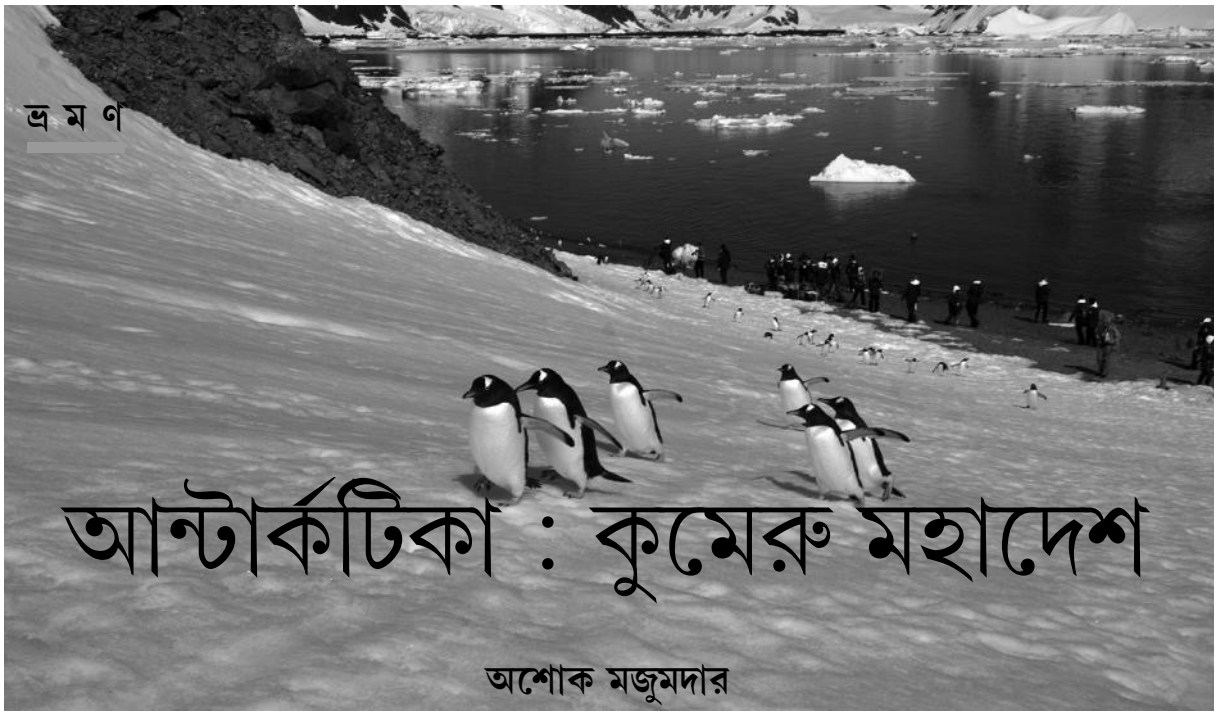

ভ্রমণ

আন্টার্কটিকা : কুমেরু মহাদেশ

অশোক মজুমদার

নামটা শুনলেই মনের মধ্যে একটা কৌতূহল, বিস্ময়ের প্রতিক্রিয়া হয়। স্কুলের ছাত্রজীবন থেকেই মিশরের পিরামিড, অরোরা বোরিয়ালিস আর পেঙ্গুইন দেখার স্বপ্ন ছিল চোখে, মিশর এখন সহজগম্য। উত্তর সুইডেনের শেষ প্রান্তে কিরুনা শহর ছাড়িয়ে কিরাবুরু জঙ্গলে, জমে যাওয়া থর্ন নদীর বুকে (মাইনাস ১৭ ডিগ্রি) দেখছি অরোরাবোরিয়ালিস—আলোর স্বর্গীয় খেলা। কৃত্রিম পরিবেশে পেঙ্গুইন আগেই দেখেছি কিন্তু তাতে মন ভরে না।

আন্টার্কটিকা কয়েকটি দেশ থেকে যাওয়া যায়—চিলি, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। বেশিরভাগ যাত্রী আর্জেন্টিনা হয়ে যায়। দমদম, দোহা হয়ে আমাদের বাইশ জনের অ্যভিয়ানা হলিডেজ-এর দল বুয়েনস্ আইরসে পৌঁছল দীর্ঘ আকাশযাত্রার পর। পরদিন কিছুটা ঘোরা। উসুআইয়া (Ushuaia) আর্জেন্টিনার শেষ প্রান্তের পৃথিবীর দক্ষিণতম বন্দরশহর, যেখান থেকে আন্টার্কটিকার জাহাজযাত্রা শুরু হয়। এই উসুআইয়া আসতে এক বিপত্তির মুখোমুখি হতে হল। মাঝরাতে উঠে এক কাপ চা খেয়ে এয়ারপোর্টে এলাম। প্লেন ছাড়ল। সাড়ে-তিন ঘন্টার পথ মাত্র। বিকেলে জাহাজ ছাড়বে, অনেক আগেই পৌঁছে যাবার কথা। মাঝপথে প্লেনে হৈ চৈ। কে নাকি অসুস্থ। অদ্ভুত এক এয়ারপোর্টে প্লেন নামল, আর ছাড়ে না। ছাড়বে ছাড়বে বলে যাচ্ছে। আমরা ক্রমশ চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি। পুলিশ এল, জানালো প্লেন আর উসুআইয়া যাবে না। বুয়েনস্ ফেরত যাবে। অন্য প্লেনে আবার আসতে হবে। আমাদের মাথায় হাত। জাহাজ আমাদের বাদ দিয়ে চলে যাবে না তো! কলকাতায় খবর গেল জাহাজে খবর দেবার জন্য। চেঁচামেচি হল, কোনো লাভ হল না। বুয়েনস্ এলাম আবার। খাওয়াদাওয়া নেই। অবশেষে সাড়ে তিন ঘন্টার যাত্রা চোদ্দ ঘন্টায় সম্পন্ন করে উসুআইয়া এলাম সন্ধ্যায়—বৃষ্টি ও হালকা তুষারপাতের মধ্যে। কেন এরকম ব্যাপার ঘটল বোধগম্য হল না কারো। অবশেষে জাহাজে ওঠা হল। পাসপোর্ট, ছাপ, ক্রেডিটকার্ড ব্যাজ, কেবিন ইত্যাদি জুটলো। রাত নটায় জাহাজ ছাড়লো—পৃথিবীর সবথেকে খারাপ সমুদ্রপথ ড্রেসপ্যাসেজের জন্য।

আন্টার্কটিকা পৃথিবীর দক্ষিণতম মহাদেশ, দক্ষিণ মহাসাগর দিয়ে ঘেরা এবং এটি পঞ্চম বৃহৎ মহাদেশ। যার আয়তন চোদ্দ মিলিয়ন বর্গ কিমি। এই মহাদেশের ৯৮ ভাগই বরফ আচ্ছাদিত, যা প্রায় ১.৯ কিমি পুরু। এই মহাদেশ সবথেকে শীতল, শুষ্ক ও বাতাসের গতিবেগও সবচাইতে বেশি। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের হিসেবে আন্টার্কটিকা এক মরুভূমি, কারণ বছরে ৮ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে (দক্ষিণ গোলার্ধ বলে শীতকাল গরমকাল আমাদের বিপরীত) তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যায়। আন্টার্কটিকায় স্থানীয় মানুষের আবাস ছিল না বা এখনও নেই, যারা যান বা থাকেন সবই সরকারি বৈজ্ঞানিক কাজে। সংখ্যাটা এক থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে থাকে। পৃথিবীর দক্ষিণে কোনো দেশের ধারণা অনেক পুরোনো হলেও আন্টার্কটিকা প্রথম মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে এক নরওয়ের নাবিক প্রথম পা রাখেন আন্টার্কটিকায়। আন্টার্কটিকা কোনো দেশের অধিকারে নেই। প্রায় চল্লিশটি দেশের 'আন্টার্কটিকা ট্রিটি সিস্টেম' (Antarctica Treaty System) এর দেখাশোনার দায়িত্বে।

উসুআইয়া আর্জেন্টিনার পাহাড়ঘেরা সুন্দর সাজানো বন্দর শহর। এটিকে আন্টার্কটিকার গেটওয়ে বলা চলে। দক্ষিণ গোলার্ধে জানুয়ারি মাসে গরমকাল হলেও পাহাড়ের চূড়া সব সাদা, শহরের কাছেই এয়ারপোর্ট। পুরো শহর ইউরোপীয় ধাঁচে সজ্জিত, যদিও দেরিতে পৌঁছানোর জন্য যাবার সময় শহর দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আলো কমে আসার মুখে আমাদের জাহাজে ঢোকা। সামনে ড্রেক প্যাসেজ।

আমাদের জাহাজ MSFRAM ২০০৭ সালে তৈরি নরওয়ের জাহাজ। ৭টি ডেকের এই বিলাসবহুল জাহাজে ১২৪টি কেবিন, দুটি লিফ্ট, একটি বড় ডাইনিং হল ও ছোটো দুটি হালকা খাবারের জায়গা রয়েছে। ছোটো শপিং সেন্টারও আছে, আছে দুটি লেকচার হলও। ভিতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত। সবকিছু বুঝে উঠতে সময় লেগে যায়। দুদিনের ড্রেকযাত্রা হজম করাই এখন বড় কাজ। সমুদ্রপীড়ার আসল জয়গা এটি, কারণ তিনটি মহাসাগরের জল মিশেছে এখানে—পুবে

আটলান্টিক, পশ্চিমে প্রশান্ত ও দক্ষিণে আন্টার্কটিক মহাসাগর। তাই এটি অশান্ত স্থান।

জাহাজে ঢুকে পরিচয়পত্র—যেটা একই সঙ্গে ঘরের চাবি, ক্রেডিট কার্ডও বটে—গলায় ঝুলিয়ে চালতলায় ডিনার সারতে হল। ঘরের সামনে লাগেজ এল। রাত দেরিতে শুরু হল, তবু রাত বলে বুঝতে অসুবিধে নেই। আমাদের ঘরের নম্বর ৩১৫। ঘরে অল্প জায়গার মধ্যে সব ব্যবস্থাই রয়েছে। কাচ-ঢাকা বড় জানালা যাতে শাটার লাগানো, আলো আটকানোর জন্য। টিভি ও ঘোষণা শোনার ব্যবস্থাও আছে—পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। প্রতিদিন ঘর পরিষ্কারের লোক ও লন্ড্রি আছে। এখন তাপমাত্রা জানালো ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, গরমকালে এখানে তাই।

আন্টার্কটিকার মূল ভূখণ্ড আন্টার্কটিক সাগর দিয়ে ঘেরা। পশ্চিম উত্তর দিকে ৬০০ কিমি লম্বা পেনিনসুলা একটা বাঁকানো ল্যাজের মতো বেরিয়েছে। এই পেনিনসুলায় অসংখ্য ছোটো ছোটো দ্বীপ রয়েছে। এই অংশ মূল ভূখণ্ডের মতো শীতল নয়। মূল ভূখণ্ডের কেন্দ্রে রয়েছে দক্ষিণ মেরু, শীতলতম স্থান। চারিদিকে কোস্টাল এলাকা ও পেনিনসুলায় বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলো রয়েছে। সব থেকে বড় কেন্দ্রটি আমেরিকার McMurdo, যা সারা বছর অনেক লোক নিয়ে কাজ করে। দক্ষিণ মেরুর সবথেকে কাছের কেন্দ্র হল রাশিয়ার ভস্তক। ভারত সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে দক্ষিণ গঙ্গোত্রী (১৯৮৫), মৈত্রী (২০০৫) এবং ভারতী (২০১৭) কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

৩১ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ৩ জানুয়ারি জাহাজে যাত্রা শুরু। ৮০০ কিমি ড্রেক প্যাসেজ পার হতে প্রায় ২ দিন লাগবে। ৪ জানুয়ারি থেকেই কারো কারো অল্প অল্প সমুদ্র-সমস্যা শুরু হল। এই দুদিনে জাহাজ উসুআইয়া থেকে আন্টার্কটিক পেনিনসুলার কাছে পৌঁছবে। আউটডোর প্রোগ্রাম নেই কিন্তু জাহাজেই পরের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হল। কোথায় যেতে হবে তার ঘোষণা অনুযায়ী চলা। প্রতিদিনের জন্য ছাপা প্রোগ্রাম প্রত্যেককে দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিন সকালেই সকলকে গাঢ় নীল রঙের 'এক্সপেডিসন জ্যাকেট' দেওয়া হল (বাতাস এবং জল নিরোধক)। এটা আগেই জানা ছিল। প্রাতরাশের পর থেকেই আন্টার্কটিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আগামী দিনে কী পরিকল্পনা ও অবতরণ বিষয়ে জানানো হল। বলা হল কী করতে হবে আর কী করা যাবে না। জিম (Jim) জাহাজের এক্সপেডিসন লিডার। মোট ২৩৬ জন অভিযাত্রী রয়েছেন। তিনটি ভাষায় কাজ চলছে—ইংরেজি, জার্মান ও চাইনিজ। চিনা পর্যটক অনেক। চার নম্বর ড্রেক সবচেয়ে ব্যস্ত জায়গা। একধারে খাওয়ার হল, ২৪ ঘন্টা অনুসন্ধান কেন্দ্র 'ব্রিস্টো', বসার জায়গা ও লেকচার হল। সব সময় জমজমাট। ডিনারের পর 'ক্যাপটেইনস ককটেল' হল ৭ নম্বর ডেক। এটা বিশাল, চারিদিক দেখা যায় এমন একটা লাউঞ্জ, কাচে ঘেরা—প্যানোরামা লাউঞ্জ। সারাদিনই এখানে বিভিন্ন গ্রুপ গল্প করছে, দেখছে, কেউ বা ঘুমোচ্ছে। ককটেলে Crew member-দের পরিচয় করানো হল।

অনেকেরই শরীর খারাপ। বমি শুরু হয়েছে। যদিও সমুদ্র খুব একটা অশান্ত নয়। ড্রেক-শেক বলা যাবে না। আমারও সামান্য অস্বস্তি হচ্ছে। এখানে ট্যুর করাতে গেলে কোম্পানিকে 'International Association of Antarctica Tour Operator'-এর সদস্য হতে হয়। যাত্রীদের প্রেটোকল মেনে চলতে হয়। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে এরা খুব সজাগ। জাহাজে ওঠা থেকে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফোম ব্যবহার করতে বলা হয়। সব জায়গায় রাখা আছে। এদিন পায়ের মাপ হিসেবে নিচে নামার হাঁটু পর্যন্ত রাবার বুট দেওয়া হল। নিচে নামতে গেলে এই বুট বাধ্যতামূলক। নিরাপত্তামূলক বিধিনিষেধ বারবার করে শেখানো হল। নিচে যে ব্যাগ বা জামাপ্যান্ট পরা হবে সেগুলিকে 'ভ্যাকুমিং' করানো হল। মোট আটটি গ্রুপ হল। আমাদের নাম 'Wandering Albatross'। এই নামের ব্যাচ সবাইকে দেওয়া হল। অ্যালবাট্রসের কথায় মনে এসে গেল স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ-এর 'Rhyme of Ancient Mariner' কবিতার কথা, যেখানে অ্যালবাট্রস বিরাট ভূমিকায় উপস্থিত। ক্রমশ আলো দেখে সন্ধ্যের হিসাব বাতিল হতে চলেছে। যত এগিয়ে চলেছি 'অ্যান্টার্কটিক সামার'-এর মধ্যে এসে পড়ছি। ৬টা নাগাদ জাহাজ এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড-এর কাছ দিয়ে এগোতে লাগল। এই দ্বীপেই ১৯০৯ সালে Sir Shakleton-এর Endurance জাহাজ

বরফের চাপে ভেঙে পড়ার পর ভেসে এসে টিমের ২২ জনকে চার মাসের বেশি এখানে কাটাতে বাধ্য হতে হয়। দুটি ওল্টানো বোটের নিচে এতদিন কাটিয়ে তাঁরা সমুদ্রযাত্রায় অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করেন। 'Endurance' সিনেমাটিও আমাদের দেখানো হল।

৬ জানুয়ারি। প্রথম ল্যান্ডিং-এর সূচি রয়েছে Brown Bluff দ্বীপে। অ্যান্টার্কটিকা পেনিনসুলাতে আমরা এসে গেছি। হিমশৈল জলে ভেসে যাচ্ছে। দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের সারি। সকালে পিনাকির খোঁজে সাত নম্বর ডেকে বেরিয়ে দেখি তুষারপাত হচ্ছে। মেঝেতে এক ইঞ্চি পুরু বরফ, তেমনি হাওয়া। জুতোর সুন্দর ছাপ পড়ছে। খুব ঠাণ্ডা—মাথা না ঢেকে থাকা মুশকিল। পেনিনসুলাতে ঠাণ্ডা অনেক কম, শূন্যের আশেপাশে থাকে, শীতে মাইনাস ১৫-১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দুঃখের খবর কিছু পরেই এল। সমুদ্র অশান্ত থাকায় Brown Bluff বাতিল। ভেবেছিলাম অ্যাডেলিয়া পেঙ্গুইন দিয়ে ভ্রমণ শুরু করব। সারা সকাল নামা হল না। শেষ বিকেলে হঠাৎ ঘোষণা হল Halfmoon Island-এ নামা হবে। তাড়াতাড়ি নিচে তিন লেয়ার, উপরে তিন লেয়ার জামাকাপড় পরে ৩১৫ হুক থেকে গামবুট আর হনুমানের ল্যাজওয়ালা লাইভ ভেস্ট ঝুলিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। গ্রুপ-৮ ডাকতে ২নং ডেকের 'গ্যাঙ্গওয়ে'-তে যাওয়া হল। লাইভভেস্ট পরতে বিশেষ করে মেয়েরা বেশ নাকাল হচ্ছে। সাহায্যকারী সবসময় রয়েছে। ৪ জন করে এক একটি 'পোলার সার্কেল বোট'-এ নেওয়া হল। জাপানি ইয়ামাহা কোম্পানির বোট সেগুলি।

প্রথম আন্টার্কটিকায় পা রাখার ব্যাপারটা যথেষ্ট উত্তেজনার ছিল। ঠাণ্ডা কেমন, হাওয়া কেমন, পেঙ্গুইন দেখা ইত্যাদি। জাহাজ থেকে বেশ কিছুটা দূরে 'এলিফ্যান্ট' দ্বীপে অনেক পেঙ্গুইন বসে আছে দেখছি। উড়তে পারে না, কিন্তু উঁচু রকে কী করে ওঠে সেটা অবাক ব্যাপার। Halfmoon দ্বীপে জলের ধার দিয়ে লম্বা বিচ যা তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরির ছাই দিয়ে। নেমেই দেখা হল বহুপ্রতীক্ষিত পেঙ্গুইনের সাথে। এখানে সব 'চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন'। মজা হল একই জায়গায় দু-রকম প্রজাতি থাকে না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একই জায়গায় হাজার হাজার একই প্রজাতির পেঙ্গুইন রয়েছে। কিছুটা দূরে ছোটো পাহাড়ের পাথরের ওপর অনেক 'চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন' বসে আছে, ডাকাডাকি চেঁচামেচি করছে। লাফিয়ে লাফিয়ে পাথরের মধ্য দিয়ে কালো পিঠ আর পেট সাদা পেঙ্গুইনের ওঠানামা দেখতে খুবই মজার। আমাদের অবশ্য কত কাছে যাওয়া চলতে পারে, সেসব ফ্ল্যাগ দড়ি দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। পেঙ্গুইনের ৫ মিটার ও সিলের ১৫ মিটারের মধ্যে যাওয়া চলবে না। তবে পেঙ্গুইন আমাদের দিকে আসছে দেখলে চুপ করে থেমে যেতে হবে, তখন হয়ত সে ৫-৬ ফুটের মধ্যে চলে আসতে পারে। পেঙ্গুইনের পুরো খাবারই জল থেকে আসে। তাই পেঙ্গুইনের দল সমানে সমুদ্রে যাওয়া আসা করে। প্রথম দিনের পেঙ্গুইনের উত্তেজনা না কাটতেই জাহাজে ফেরার সময় হয়ে গেল। রাতে আধো অন্ধকার পাওয়া গেল। ক্রমশ রাত বিদায় নিচ্ছে আর দিনের আধিপত্য বাড়ছে।

আন্টার্কটিকা পেনিনসুলার মাথায় রয়েছে Shetland Islands। তারই Greenwich Island-এYankee Harbour (এক সময় আমেরিকানদের তিমি ধরার জায়গা)-এ যাওয়া হচ্ছে আজ। এক কিমির বেশি কালো বিচ, এখানে ওখানে বরফের সাদা রং। একটু দূরেই সাদা বরফের পাহাড় উঠে গেছে। অসংখ্য 'Gentoo' পেঙ্গুইন সবদিকে—পেঙ্গুইন কলরব-মুখর। প্রায় চার হাজার এ-জাতীয় পেঙ্গুইন রয়েছে এখানে। সব মিলে এক অদ্ভুত জনমানবহীন নির্জন প্রান্তর। বড় বড় এলিফ্যান্ট সিল শুয়ে আছে মড়ার মতো। বড়ই আলসে ওরা। একজোড়া Skua পাখি তাদের ডিম পাহারা দিচ্ছে—কাছে যাওয়া বারন। মাঝে মাঝেই চিৎকার করে ওরা আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে—যাতে কাছে না যাই। পেঙ্গুইনরা খুব চেঁচামেচি করে ও সেই সাথে ঝগড়া মারামারিও করে। অনেকক্ষণ পেঙ্গুইন সঙ্গ করা গেল।

বিকেলে হঠাৎ সুসংবাদ। দ্বিতীয় অবতরণ করা হবে Argentime Camara Station-এ। কয়েকটা নীল বাড়ি, মাখনের মতো বরফ-ঢাকা দ্বীপ। বরফে পা ডুবিয়ে রবার-বুট পরে মহাপ্রস্থানের পথে হেঁটে চলা। কী যে দৃশ্য! মনে হয় কেন হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে যেতে দিচ্ছে না। কিছুটা এগোনোর পর 'No further' হুকুম। এখানে কোনো পেঙ্গুইন ছিল না। পেঙ্গুইনরা যেহেতু জলনির্ভর, জীবনের অর্ধেক সময় জলে কাটায়, তাই এরা আন্টার্কটিকার তীরবর্তী এলাকায় বরাবরই বাস করে। একমাত্র 'Emperor Penguin' প্রজননের সময়

শতাধিক কিমি মূল ভূখণ্ডে ঢোকে ও না-খেয়ে সময়টা কাটাতে হয়। এদের এই প্রজনন যাত্রা অতি কঠিন ও দুর্গম, যা কিনা শীতকালেই ঘটে থাকে। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘটে চলেছে। পেঙ্গুইনের ১৬ থেকে ১৮টি প্রজাতি রয়েছে আলাদা আলাদা জায়গায়। কাজেই সবগুলিকে একবারে দেখা কার্যত অসম্ভব।

৮ জানুয়ারি Deception Island-এ যাওয়া হল। এটি একটি আগ্নেয়গিরির বেসিন। এখানে তিমি ধরা হতো। একটি ব্রিটিশ পোতও ছিল কিন্তু আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ তাকে নষ্ট করে দেয়। কয়েকটি ওয়্যারহাউস পড়ে আছে। দুটো চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইনের ঝগড়া-মারামারির ছবি তুললাম। কাছেই 'Telefon Bay'। ওই নামের জাহাজ ১৯০৯-এ এখানে আটকে পড়েছিল। এখানে আগ্নেয়গিরির ছাই ঢাকা পাহাড়ি পথে সুন্দর ট্রেক রয়েছে। উপর থেকে বরফে ঢাকা পাহাড়। সবুজ লেক, দূর সমুদ্র, অসাধারণ নৈসর্গিক চিত্র।

চিকিৎসক হিসেবে মনে হল জাহাজে চিকিৎসাব্যবস্থা কী আছে দেখা যাক্। দেখা গেল জাহাজে একটা মিনি হাসপাতাল আছে। দু-কামরার দুটি বেড, ইমারজেন্সি ব্যবস্থা, এক্স-রে, ইসিজি মেশিনও আছে। পানামার একটি অল্পবয়সী মেয়ে একমাত্র ডাক্তার।

৯ জানুয়ারি : ডেকের প্যানোরামা লাউঞ্জটি একটা ফুটবল মাঠের মতো বড়ো, তিনদিক কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, মাঝে বার—সব সময় খোলা। সকালে ছবি তুলবো ভেবে বেরিয়ে দেখি তুষারপাত চলছে। চারিদিক মেঘকুয়াশায় মাখামাখি। আমাদের জাহাজ এক দারুন সুন্দর চ্যানেল দিয়ে চলেছে। ১৮৯৭-এ আবিষ্কৃত Wilhelmina Bay। দুপাশে গ্লেসিয়ার-ঢাকা পাহাড়-চূড়া, নীল বরফের চাঁই, হিমশৈল ভেসে চলেছে দুধারে। এই তো সুন্দরী আন্টার্কটিকা! বড় বড় হিমশৈলতে ঘুমিয়ে আছে কাঁকড়াভোজী সিলেরা, পেঙ্গুইন জলে ডুবছে উঠছে। আনন্দসংবাদ এল 'Polar Circle Boat Cruise'-এর। কুড়ি মিনিট স্পিডবোট বিহার হলো—মনোরম অভিজ্ঞতা।

আজ বোটে করে গেলাম Cuvervile Island-এ। পুরোটাই বরফে ঢাকা পাহাড়। হাজার হাজার পেঙ্গুইন চারিদিকে। তাদের কলরব শোনা যায় বহু দূর থেকে। আন্টার্কটিকায় পেঙ্গুইন টিকে থাকার কারণ পেঙ্গুইনের ডাঙায় কোনো শত্রু নেই। জলে আছে Orca এবং Leopard সিল। আর একটা বড় কারণ হল এখানে মানুষ নামক জীবের আবাস বা আনাগোনা নেই। বরফে হাঁটু ডুবিয়ে ছোটো ট্রেক করা গেল তুষারপাতের মধ্যেই। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। ডাইনে বাঁয়ে পেঙ্গুইনদের সামলে চলা। সব দ্বীপেই ভ্রমণসংস্থার লোকেরা আগে গিয়ে আমাদের জন্য লক্ষণরেখা টেনে রাখছে— যাতে কোনো বিপদ না ঘটে ও পেঙ্গুইন মহারাজেরা বিরক্ত না হন।

বিভিন্ন দ্বীপে নামা ছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয়—Kaya King Camping ও Polar Cruise রয়েছে। যার জন্য আলাদা বুকিং করতে হয়। আজ রাতে (যদিও এখন আর রাত হচ্ছে না) আমাদের বিনীতা ক্যাম্পিং-এর বাইরে থাকবে। ওদের ১০টার সময় পাশের দ্বীপে নামালো, তাঁবু খাটানো হল।

একটা হিমশৈল হঠাৎ ভাঙতে শুরু করল। কাত হয়ে গেল। জলে ডুবতে থাকলো। চোখের সামনে অতবড় একটা জিনিস টুকরো টুকরো হয়ে যেন মিলিয়ে গেল।

১০ জানুয়ারি : বিলাসবহুল এই নরওয়ের জাহাজে সমস্ত ব্যবস্থাকে নিখুঁত বলা চলে। খাওয়া দাওয়া থেকে টেকনিক্যাল, নন-টেকনিক্যাল কর্মীদের ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা, আরামের বন্দোবস্ত সবই তুলনাহীন। সাধারণ কর্মীরা বেশিরভাগ ফিলিপিনো। হাসিমুখ সর্বদা। রাতের ডিনারে এক-একজনের জন্মদিন পালনও বাজনা বাজিয়ে কেক মোমবাতি সহ হচ্ছে। ৭ জানুয়ারি। আমি প্রথমে ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে পারিনি। আমার জন্মদিন। আসলে ১৪ ফেব্রুয়ারি হলেও পাসপোর্টে ৭ জানুয়ারি। একটু বাদে বুঝলাম। ভালোই লাগল আন্টার্কটিকায় আমার জন্মদিন পালন। জাহাজে লাইব্রেরি, শপিং সেন্টার রয়েছে।

আজ দুটো দ্বীপে নামার পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে Neko Harbour-এর বিশেষত্ব হল এটি আন্টার্কটিকা পেনিনসুলার মূল ভূখণ্ডে। এটা জেনে আমি বেশ উত্তেজিত। Neko নামের Whaling Ship এখানে প্রথম আগে ১৯০০ সালে। সেই থেকে এই নাম। চারিদিকে সাদা পাহাড়ের সারি, মাঝে Neko। নেমে দেখি চালু বরফের পাহাড় উঠে গেছে ডাইনে বাঁয়ে, সঙ্গে জেন্টু পেঙ্গুইনের দলের সমুদ্রে আসা যাওয়া। আজ সবটা উঠব ঠিক করেছিলাম, তাই

নেমেই বরফের খাঁজের তৈরি পথে উঠতে থাকলাম। অভাবনীয় সুন্দর দৃশ্য।

দ্বিতীয় অবতরণ হল Paradise Bay-তে। নীল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্যালোক, ভেসে চলা বরফখণ্ড, সাদা পাহাড় সব মিলে অপার্থিব দৃশ্য। ডাইনে বাঁয়ে সাদা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠা। দূরে আর্জেন্টিনা ও চিলির কিছু স্টেশন রুম। মাঝে মাঝেই বিরাট শব্দ করে জলের ধারের নীল বরফের দেয়াল থেকে বড় বড় বরফখণ্ড ভেঙে পড়ছে। নীল সাগরে দুপাশে সাদা ঢেউয়ের রেখা কেটে 'পোলার বোট'গুলো জাহাজে যাচ্ছে আসছে। দৃশ্যের পরিপূর্ণতা একেই বলে!

ডিনারের পর প্যানোরামায় 'Cultural Night' হল। জাহাজের কর্মীরা নানা ধরনের নাচগান পরিবেশন করল। আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত, নাচ যেমন ছিল তেমনি ছিল রক পপ। খুবই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হল।

আন্টার্কটিকার জীবকুলের মধ্যে পেঙ্গুইন ছাড়া উল্লেখযোগ্য হল সিল ও তিমি। এ অঞ্চলে Humpback Whale একটা বড় আকর্ষণ।

১১ জানুয়ারি ১৯০৩-০৫ সালে Auguste Charcot আবিষ্কার করেন Port Lockroy দ্বীপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা পেনিনসুলায় দুটি বেস তৈরি করে। একটি Port Lockroy এবং অপরটি পূর্বোক্ত Whales Bay, Deeaption Island। ব্রিটিশরা এই বেস ১৯৬২ পর্যন্ত ব্যবহার করে। তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৯৬-এ সারিয়ে তুলে Antarctic Heritage Trust গড়ে তোলা হয় এখানে। পোস্ট অফিস সহ এটি আন্টার্কটিকার একমাত্র মিউজিয়ম, সঙ্গে স্যুভেনির শপ। ব্রিটিশ সৈন্যরা যেভাবে ব্যবহার করত, ঘরগুলি সেভাবেই (কিচেন, বাথ, শোবার ঘর, রেডিও রুম, মেশিন রুম, বই ইদ্যাদি) অপরিবর্তিত রয়েছে। বেডের পাশে দেওয়ালে অর্ধনগ্ন নারীচিত্র। আন্টার্কটিকায় এখানে বছরে সব থেকে বেশি ট্যুরিস্ট আসে। প্রচুর জেন্টু রয়েছে এখানে।

দুপাশের স্থির নীল জলে বরফঢাকা পাহাড়ের প্রতিবিম্ব ছবির মতো লাগে। বিকেলে আন্টার্কটিকার সব থেকে সুন্দর Lamaire Channel-এ আমাদের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জলে ভাসমান বরফের বড় বড় চাঁই, হিমশৈল থাকায় ক্যাপ্টেন জাহাজ ঘুরিয়ে নেন। তবে কুড়ি মিনিটের আর একটা Boat Cruise করানো হল। Crabeater Seal সব ভাসমান বরফে শুয়ে আছে। একটা হিমশৈলের স্থাপত্য আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। ঠিক যেন এক রাজবাড়ির সাজানো হল। প্রকৃতির খেলা কী অপরূপ হতে পারে! কাল শুনলাম চাঁদ দেখা যাচ্ছে অনেক রাতে। তাই আজ ক্যামেরা নিয়ে তৈরি থাকলাম। সাদা পাহাড়ের পিছন থেকে অদ্ভুত সুন্দর চন্দ্রোদয় দেখলাম।

১২ জানুয়ারি ২০১৭ : আমাদের শেষ দ্বীপে নামা। পদার্থবিদ Belgian Danco-এর নামে Danco Island সুন্দর জায়গা। ১৮৯৮-এ Danco বরফে আটকে পড়েন। প্রথম তিনিই আন্টার্কটিকায় শীতকাল কাটাতে বাধ্য হন। আজ বরফে ট্রেক করতে ঘুরতে অনেক সময় দেওয়া হল। মনোহর দৃশ্য, পেঙ্গুইন এক্সপ্রেসের সমুদ্রে আসা-যাওয়া, জলে মারামারি, কায়াকের ঘোরাঘুরি দেখে সময় কেটে গেল। ফিরে এসে আবার একসঙ্গে ফটোশেসন হল। জলের নিচে পেঙ্গুইনের সাঁতার কাটার ছবি পেলাম। দুঃখ রইল Emperor, King, Adlie না দেখতে পাওয়ার।

একটু আগে দেখছিলাম দুটো বোট কিছুটা দূরে একটা ভাসমান বিস্তৃত বরফের চাদরে গেল এবং এল। কয়েকজন সেখানে নামল। এবার বলা হল অল্পক্ষণের জন্য ওখানে নামানো হবে। সমুদ্রের বরফে এর আগে কখনও ট্যুরিস্টদের নামানো হয়নি। আমরাই প্রথম। বিরাট

উত্তেজনা। অবশেষে আমাদের গ্রুপের ডাক এল। সাগরবুকে যেন বরফের মাঠ। ২০ মিনিট সময় প্রত্যেক গ্রুপকে। কতটা যাওয়া যাবে লক্ষণের গণ্ডিতে বেঁধে দেওয়া হল। এক মিটার পুরু বরফ পায়ের নিচে। ভীষণ আনন্দে আপ্লুত হয়ে ছবি তুলে সবাই মিলে নিরাপদে জাহাজে ফেরা হল।

এবার শুরু ফিরে চলা। অধ্যাপক অজিত হালদার (৮০) ও তাঁর স্ত্রী বেলাদি দলে আছেন। অজিতবাবুর উদ্যম, সাহস ঈর্ষণীয়। পিনাকী আমার Aviana Tour-এ সদাসঙ্গী। আমার সহপাঠী প্রসেনজিৎ সহ অনেকেই পূর্ব-পরিচিত।

১৩ জানুয়ারি সকালে আমরা Bridge visit অর্থাৎ জাহাজের ককপিট দেখে এলাম। আবার বক্তৃতা শুরু হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। Shackleton-এর ওপর Film 'Sea Bird' নিয়ে আলোচনা। পেঙ্গুইন ছাড়া Albatross, Petrel, Tern, Gull-এর কিছু প্রজাতি দেখা গেছে।

ড্রেক প্যাসেজে আবার ঢুকতে চলেছি। উত্তেজনার অবসান। ভ্রমণসহকারী জিম তার লেখা Shackleton-এর বই নিয়ে সুন্দর উপস্থাপনা করল। Shackleton–A Life in Poetry কিনে জিমের সই করিয়ে নিলাম। রাতে ক্যাপ্টেনের সাথে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব।

১৪ জানুয়ারি : ড্রেক প্যাসেজ শান্ত থাকে বলে এবার যাওয়া হল ড্রেক লেকে। তবুও আমাদের কেউ কেউ অসুস্থ। বিকেলে ক্যাপ্টেনের 'ফেয়ারওয়েল ককটেল' হল। তারপর বিভিন্ন জিনিসের Fram Charity Auction। শেষ আইটেম জিমের শার্ট ৬০ ডলারে একজন নিল। এখন অভিযানের শেষ রজনী। কাল সকালে প্রায় দু-সপ্তাহের আবাসকে বিদায় জানাতে হবে।

এখনও পর্যন্ত সব ভ্রমণের সেরা ভ্রমণ এই অত্যাশ্চর্য আন্টার্কটিকা।

পরিশেষে বলি—আন্টার্কটিকার মূল ভূখণ্ড ট্যুরিস্টদের পক্ষে অগম্য ও অসম্ভব ব্যাপার। Scientific Expedition-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের পক্ষেই কেবল জনমানবহীন তীব্র ঠাণ্ডা (গরমকালে মাইনাস ১৭-১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ও ঝঞ্ঝাপূর্ণ তুষার রাজ্যে বৈরী পরিবেশ থাকা সম্ভব। এই কঠিন পরিবেশই আন্টার্কটিকাকে অনন্য ও মোটামুটি মানবদূষণমুক্ত রেখেছে। তবুও যেভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা মানবদূষণের ফলে বেড়ে চলেছে তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে। অল্প কিছুদিন আগেই ice shelf থেকে কয়েক ট্রিলিয়ন টন ওজনের একটি হিমশৈল তৈরি হয়েছে। যদি কল্পনা করা যায় 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা বিশ্ব উষ্ণায়ণে আন্টার্কটিকার সব বরফ গলে যায় তবে সমুদ্রের জলস্তর ২০০ ফুট বেড়ে মানবজাতির সলিলসমাধি ঘটাবে।

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

এলাকাবাসীকে শারদোৎসব, দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানায়

নবস্থা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ ও কর্মীগণ

Sl. No. 138

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

মাধব ঘোষ

কালনা

Sl. No. 156

With best compliments of

A
Well Wisher

KOLKATA

Sl. No. 157

ফ্রান্সের রাজনীতি ও অর্থনীতির এক খণ্ডচিত্র

গোপা সামন্ত

এবছরই ফ্রান্সে নির্বাচন হয়েছে এবং তাতে জয়লাভ করেছেন মধ্যপন্থী ম্যানুয়েল ম্যাক্রঁ। ফ্রান্সের নির্বাচন পদ্ধতিটি একটু অভিনব। প্রথম দফায় নির্বাচনের পরে যে দু-জন সর্বাধিক ভোট পান, তাঁরা আবার দ্বিতীয় দফার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য। সবশেষে একজন নির্বাচিত হন। দু-দফার ভোটেই প্রত্যেক নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দফা নিয়ে বিশেষ সমস্যা থাকে না, কারণ প্রার্থী সব দলেরই থাকে। ফলে যিনি যে দলের সমর্থক তিনি তাঁদের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। সমস্যাটা শুরু হয় দ্বিতীয় দফায়। কারণ তখন দু-জন ছাড়া বাকি সকলেই বেরিয়ে গেছেন, অথচ সব নাগরিকই ভোট দেবেন। ফলে প্রত্যেকের পছন্দের দলের প্রার্থী থাকে না। বেশ কিছু মানুষকে দ্বিতীয় পছন্দের বা কাছাকাছি পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে হয়। অনেকেই সে ক্ষেত্রে ভোট দিতে যেতে আগ্রহ দেখান না।

এবার ভোটেও প্রবল সংকট উপস্থিত হয়েছিল ভোটের দিন। একে সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি আর তার ওপর নিজেদের পছন্দের প্রার্থী নেই বলে বামপন্থী মানুষরা কেউই বিশেষ ভোট দিতে যেতে চাইছলেন না। বিপ্লব, গণতন্ত্র ও বামপন্থার জন্ম যে দেশে, সেদেশে বামপন্থার হাল সারা বিশ্ব তথা আমাদের দেশের মতো অতটা খারাপ হয়নি। এখনও যে তার বেশ জয়জয়কার তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি গত বছরের 'শ্রম আইন সংস্কার বিরোধী' আন্দোলনের সময়। ভোটের দিন দুপুর পর্যন্ত অনেকেই ভোট দিতে না যাওয়ায় চরম দক্ষিণপন্থী প্রার্থী মরিন ল্য প্যাঁ-র জিতে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়। তখন সবাই নিজেদের চেনা-পরিচিত সকলকে ডাকাডাকি করে ভোট দিতে গেল এবং সবশেষে জেতাল মধ্যপন্থী ম্যানুয়ের ম্যাক্রঁকে। তাতে যে সারা পৃথিবী স্বস্তির শ্বাস নিল, তা আমরা সকলেই জানি।

কিন্তু ফ্রান্সের বর্তমান অবস্থা আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তাতে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পথটি আর যাই হোক, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অন্তত ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ও বহু মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে আমি যা বুঝেছি। আসা যাক সে কথায়। ফ্রান্সও ব্রিটেনের মতো এক সময় দাপিয়ে রাজত্ব করেছে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সত্যি বলতে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স উপনিবেশ হিসেবে বেশ একটা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ফ্রান্সের দখলে অবশ্য বেশি ছিল আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সেইসব দেশের বেশিরভাগ স্বাধীনতা লাভ করে বেরিয়ে যায়। তবে চাইলেই কি আর বেরিয়ে যাওয়া যায়? আফ্রিকার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলি স্বাধীনতা পেলেও সেইসব দেশ থেকে সম্পদের একমুখী প্রবাহ বিশেষ বন্ধ হয়নি। কিন্তু সেসব দেশেও বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে ফরাসি কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন। তাই ফ্রান্সের ভাঁড়ারে এখন বেশ টান।

একসময় উপনিবেশ থেকে প্রচুর রোজগার করে নাগরিকদের দেওয়া হতো নানান ধরনের অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা, যার পোশাকি নাম হল 'সামাজিক সুরক্ষা'। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি বেশিরভাগই কল্যাণকারী রাষ্ট্র। কিন্তু ফ্রান্সের সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে সে-রকম দেশের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। বেকারদের যে পরিমাণ ভাতা দেয় তাতে কাজ না করেও কিছু লোকজন দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকতে পারে। বাচ্চাদের জন্য বিনা খরচে লেখাপড়া ছাড়াও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। ছেলেমেয়ে সমেত মা যদি একমাত্র অভিভাবক হন, তাহলে নানান সুযোগ-সুবিধা ও মাসিক ভাতার পাশাপাশি থাকার জন্য বাড়িও পান সামাজিক আবাসনে। কোনো নাগরিককে চিকিৎসার জন্য কোনো খরচ করতে হয় না।

কয়েক বছর আগে পেনশন রিভিশনের একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। জনগণের ধর্মঘট ও প্রতিবাদের চাপে সরকার পিছু হঠতে

বাধ্য হয়। আবার একবার চেষ্টা হল কাজ থেকে অবসরের বয়সটাকে যদি একটু পিছিয়ে দিয়ে পেনশনের খরচ কমানো যায়। সে চেষ্টাও বরবাদ হল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে। ফরাসি জনগণ জানিয়ে দিল অত বুড়ো বয়স পর্যন্ত তারা খাটতে পারবে না। আসলে আমি নানান কথা প্রসঙ্গে যেটুকু বুঝেছি যে ফরাসি জনসমাজ এত ধরনের সুযোগ-সুবিধায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তারা কোনোভাবেই সেসব থেকে সরকারকে হাত গোটাতে দেবে না। তাই সামাজিক সুরক্ষার অতিরিক্ত চাপ ফরাসি অর্থনীতির একটা বড় সমস্যা এবং তার চটজলদি সমাধান যে ফরাসি সরকারের হাতে নেই সেটা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না।

সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত সমস্যাতেও ফ্রান্সের অবস্থা ভালো নয়। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে প্যারিসে এবং ২০১৬ সালের জুলাই মাসে নিস শহরে যে সন্ত্রাস ঘটেছে তার মোকাবিলায় ফ্রান্সের অবস্থা বেশ কাহিল। আগে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সংক্রান্ত খরচ বেশ কম ছিল, কারণ ফরাসিদের নিরাপত্তার কড়াকড়ি বিশেষ একটা পছন্দের ছিল না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তা খাতে নিয়োগ ও খরচ বেড়েছে বহুগুণ। সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা শহরগুলিতে এখন যেভাবে দেখা যায় তা ২০১০ সালে যখন গিয়েছিলাম তখন কোথাও তেমন নজরে পড়েনি। সেনাবাহিনীতে ব্যাপক সংখ্যক নিয়োগের পোস্টার আমি গত বছরই ফ্রান্সে অনেক দেখেছি।

সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ফরাসি বুদ্ধিজীবীরা নানারকম মত পোষণ করেন। অনেকেরই মত আফ্রিকান ও এশীয় মানুষ বহুদিন ধরে ফ্রান্সে বসবাস করলেও ফরাসি সমাজের মূলস্রোতে তারা মিশে যেতে পারেনি। আমি তো নিজেই দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিরাপত্তারক্ষীর চাকরিগুলোতে যত কালো চেহারা নজরে পড়েছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তত পড়েনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরগুলোতে কিছু ক্লার্ক থাকলেও অধ্যাপক পদে তেমন উপস্থিতি নেই।

আসলে আফ্রিকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলো থেকে ফ্রান্স পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রচুর কালো মানুষদের নিয়ে এসেছিল শ্রমিকশ্রেণির কাজগুলো করার জন্য, যেগুলো ফরাসি নাগরিকরা করতে চাইতেন না। সত্তর ও আশির দশকে সেইসব শ্রমিকদের অনুমতি দেওয়া হয় তাদের পরিবারের লোকজনদের নিয়ে আসার জন্য। সেইসব শ্রমিক পরিবারের পরের প্রজন্ম একটু লেখাপড়া শিখে খানিকটা এগোলেও এখনও ফরাসিদের মূলস্রোতে পৌঁছতে অনেক দেরি।

এছাড়াও আছে ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা মধ্য-পূর্ব এশিয়া থেকে আগত। প্যারিসের এশীয় ও আফ্রিকানদের পাড়াগুলি ঘুরলেই ফরাসি মূল সমাজের সঙ্গে তফাৎটা বেশ নজরে পড়ে। এসব জায়গাতেই হয়তো জন্ম নিচ্ছে ঘরের ভিতরের সন্ত্রাস। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্রের প্রধান ক্রেতা সৌদি আরব। ফ্রান্স বছরে প্রায় দশ মিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র বিক্রি করে সৌদি আরবকে। সৌদি আরব আবার মধ্য এশিয়ার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে মদত দেয়। আমার বন্ধুর সন্দেহ ফ্রান্সের রপ্তানি করা অস্ত্রই আবার হাতবদল হয়ে ফ্রান্সে ফেরত আসছে হয়তো।

ফ্রান্সের অর্থনীতির আর একটি বড় সমস্যা হল মধ্য এশিয়া থেকে আগত বিপুল পরিমাণ শরণার্থীর চাপ। এই চাপ অবশ্য শুধু ফ্রান্সের নয়, রয়েছে আরও অনেক ইউরোপীয় দেশের। ব্রিটেন তো চাপ সামলাতে না পেরে বেরিয়েই গেল ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে। শরণার্থীর সংখ্যা এতই বেশি যে শিবিরগুলো ছাড়াও অনেকে ফুটপাতে বসবাস করে। গত বছর কনকনে ঠাণ্ডায় প্যারিসের ফুটপাতে লোকজনদের রাত কাটাতে দেখেছি। অনেকেই ওই ঠাণ্ডায় মারাও যান। সেখানে আবার শিবির বানিয়ে সরকার শরণার্থীদের রাখার ব্যবস্থা করে। সেখানকার নাগরিকরা বিদ্রোহ শুরু করে স্থানীয় পরিবেশ খারাপ হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

মধ্য এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও শরণার্থীর ঢলের জন্য অনেক ফরাসি বুদ্ধিজীবী সরকারকেও দায়ী করে তাদের খনিজ তেল সংক্রান্ত বিদেশনীতির জন্য। তবে ফ্রান্সের জন্য যেটা ভালো খবর তা হল ফ্রান্সের অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার খবর শরণার্থীদের কাছেও আছে। তাই যখন তাদের ইউরোপ আগমনের পর দেশ পছন্দের সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়, তাতে ফ্রান্স বেশিরভাগ সময়েই প্রথম সারিতে থাকে না।

সবশেষে আসা যাক শ্রম আইন সংশোধন ও তার বিরোধী যে আন্দোলন আমি গত বছর দেখে এসেছি তার কথায়।

ফ্রান্স তো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দেশ। তাই এদেশের প্রতিটি শহরেই আছে প্রতিবাদ করার জন্য একটি করে রিপাবলিক নামের বড়সড় এলাকা এবং এগুলির অবস্থান সাধারণভাবে শহরগুলির কেন্দ্রে। গত বছর মার্চ মাসে শুরু হয় নানা ধরনের ছোটোখাটো প্রতিবাদ ও ধর্মঘট। এই প্রতিবাদ ছিল তৎকালীন সরকারের শ্রম আইন সংশোধনের চেষ্টার বিরুদ্ধে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নিজেদের মতো করে শ্রম আইন পরিবর্তন করে নিলেও সামাজিক সুরক্ষা ও গণতন্ত্রের দেশ ফ্রান্সে তার কোনোদিন পরিবর্তন হয়নি। সরকার সেই আইন সংশোধনের চেষ্টা করতেই বামপন্থী ছাত্র ও নাগরিক সংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করে। প্রথমে শুরু হয় পরিবহণ ধর্মঘট, তবে তা আমাদের দেশের মতো অচলাবস্থা তৈরি করেনি।

সামাজিক সুরক্ষার কল্যাণে সরকারি বা বেসরকারি যে-কোনো সংস্থাই যখন কর্মী নিয়োগ করে তখন তাদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগের জন্য সরকারকে প্রচুর টাকা দিতে হয়। তার ওপরে আবার নিয়ম আছে যে-কোনো কারণে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হলে তাকে অনেকদিনের আগাম নোটিশ দিতে হয়। এইসব ফাঁসের হাত থেকে বাঁচতে বেসরকারি সংস্থাগুলি স্বল্প সময়ের চুক্তিতে নিয়োগ করছে। কিছুতেই স্থায়ী নিয়োগের দিকে হাঁটছে না। সরকার তো বহুদিন ধরে ব্যাপক নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। সব মিলিয়ে অবস্থাটা শাঁখের করাতের মতো। শ্রম আইন সংশোধন না করলে স্থায়ী নিয়োগ বাড়বে না। আবার সংশোধন করলে বেসরকারি কোম্পানিগুলি শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা দিতে চাইবে না।

আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি বিষয়টি নিয়ে অল্পবিস্তর সকলেই সংশয়ে আছে। তবে আমার বন্ধু সিলভির মতো বামপন্থীরা এর একেবারে বিরোধী। তাদের সাফ কথা, এ হল সরকারের কারসাজি। সামাজিক সুরক্ষা কমাতে দেওয়া যাবে না। তাহলে গরিব মানুষ না খেয়ে বিনা-চিকিৎসায় মরবে। একবার সুযোগ দিলেই সামাজির সুরক্ষার দায় চলে যাবে বাজারের হাতে। আলাঁর মতো মানুষদের মতে আবার শ্রমিক আইন সংশোধন না করলে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ বাড়বে না। সমস্যায় পড়বে ফ্রান্সের যুব সম্প্রদায়। বেকারত্বের হার এখন দশ শতাংশ, যা আরও বাড়তে পারে ভবিষ্যতে।

তবে আন্দোলনকারীরা ২০১৬-র এপ্রিল মাসে 'ন্যুই দ্যবু' অর্থাৎ ধারাবাহিক 'রাত জাগা' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপাতত ভেস্তে দিয়েছে শ্রম আইন সংশোধন। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই বলবে। তবে বর্তমান অবস্থাটা যে ফ্রান্সে খুব সুবিধাজনক তা একেবারেই বলা যাবে না। দেখা যাক ম্যানুয়েল ম্যাক্রঁ কতদূর কী করতে পারেন।

শেক্সপিয়রের জন্মভূমিতে রবীন্দ্রদর্শন

অরবিন্দ সরকার

শেক্সপিয়র জন্মেছিলেন যে ঘরে

আমার ইউরোপ ভ্রমণ শুরু হল ২১ জুন ২০১৬ তারিখে। কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাত্রি ৯.৩৫মিনিটে ইতিহাট এয়ারওয়েজে আবুধাবি হয়ে লন্ডন হিথরো আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটিতে পৌঁছালাম ২২ জুন সকালে। আবহাওয়া তখন একটু মেঘলা। এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। গাড়ি এল। আমাদের গন্তব্য লন্ডন শহর থেকে একটু দূরে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে, বাকিংহাম প্যালেস—সেখানে রানি এলিজাবেথ-২-এর 'চেঞ্জ অব গার্ড' দেখা, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, পার্লামেন্ট ভবন, ভারতীয় দূতাবাস, পিকাডেলি, বিবিসি-র হেড অফিস ইত্যাদি দর্শন করে লিওনার্দো হোটেলে আমাদের প্রবেশ। সঙ্গে আমার একমাত্র মেয়ে সুচেতা। ওর ছোট্টবেলার ইচ্ছে ছিল একবার হ্যারি পটার-এর দেশে যাওয়া। তার ইচ্ছাও পূর্ণতা পেল। লং জার্নি শেষে রাতের খাবার খেয়ে বরাদ্দ রুম-এ গল্প করতে করতে ঘুমিয়েও পড়লাম। ভোরে ঘুম ভাঙল।

পরের দিন আমাদের গন্তব্য লন্ডন সিটি পেরিয়ে অ্যাভন নদীর তীরে স্ট্র্যাটফোর্ড। সেখানে জন্মেছিলেন ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়র। শহর ছাড়িয়ে দুপাশে সবুজের সমারোহ। শরতের আকাশ। আবার কখনো কালো মেঘের প্রলেপ। প্রায় ঘন্টা ছয়েক পেরিয়ে কবির গ্রামে ঢুকলাম। এই জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে স্ট্র্যাটফোর্ড। মায়াময় সবুজ গাছপালা দিয়ে ঘেরা প্রাচীন এই জনপদ। প্রথমেই চোখে পড়ল অ্যাভন নদী। ছোট্ট নদী। তির তির করে বয়ে চলেছে। পার্ক, বোটিং সবই আছে। দোকানপসার সাজানো। একেবারে ঘিঞ্জি নয়। খোলামেলা। কেউ রাস্তার ধারে গান গাইছে গিটার বাজিয়ে, কেউবা

শেক্সপিয়রের জন্মস্থানে কন্যার সঙ্গে লেখক

স্যাক্সোফোন-এ সুর দিচ্ছে। আবার কেউ যেমন খুশি সাজো-তে যোদ্ধা বেশে সাহসী সৈনিক। আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে আমরা প্রথমেই হাজির হলাম শেক্সপিয়রের স্ত্রী অ্যান হ্যাথওয়ের আবাসগৃহে। খুবই সুন্দর। নানা রঙের ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা। সেই প্রাচীন ঘরবাড়ি এখনও কী যত্নে অবিকৃত রয়েছে!

এরপর আমরা গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটাপথে কবিশ্রেষ্ঠ উইলিয়াম শেক্সপিয়রের জন্মগৃহে প্রবেশ করলাম। দেহ ও মনে এক অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে। দোতলা বাড়ি। ওক গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। এখনো অক্ষত—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। নিচ তলায় ব্যবহৃত নানা আসবাবপত্র, বাসনকোসন। দোতলায় কবির আঁতুড়ঘর। ছাদ কাঠের তৈরি। চৌচালার মতো। অভিনয়ের পোশাক, নানান সাজ সরঞ্জাম, সেই সময়ের বিভিন্ন অস্ত্রাদি রাখা আছে। একজন প্রবীণ মানুষ আমাদের সুন্দরভাবে জানাচ্ছিলেন সেখানকার ইতিহাস। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি। নিচে এক জায়গায় তথ্যচিত্রের মাধ্যমে কবির জন্মকথা, জীবন ও কর্মকাণ্ড দেখানো হল।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি বাড়ির পেছনের বাগানে খোলামঞ্চে শেক্সপিয়রের নাটক অভিনীত হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ। অভিনয় শেষে একজন নাট্যকর্মী বললেন, ইচ্ছে করলে আপনিও কোনো বিশেষ নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব রাখতে পারেন। আমি দুটি নাটকের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে পেশ করাম—Tempest এবং Romeo Juliet। ওরা ওই দুটি নাটকের নির্বাচিত অংশ অভিনয় করে দেখালেন। অনবদ্য।

এরপর হঠাৎই চোখে পড়ল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জের আবক্ষমূর্তি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছুটে গেলাম। দুচোখ ভরে দেখলাম। মহাকবির জন্মভূমিতে একমাত্র ভারতীয় দার্শনিক কবির এই অসামান্য মূর্তি আমাদের অন্য জগতে নিয়ে গেল। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে শেক্সপিয়রের জন্ম আর রবীন্দ্রনাথের ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে—তিন শতাব্দীর ব্যবধানে উভয়ের কী দার্শনিক মিল!

এরপর আমরা লাইব্রেরি, পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র দেখলাম। কিছু সংগ্রহ করলাম। তারপর একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেয়ে আরও কিছুক্ষণ অ্যাভন নদীর তীর ঘুরে লন্ডনের পথে রওনা দিলাম।

With best compliments of

BHADRESWAR RICE MILL

NH-2, Paraj

...we care for your health...

Sl. No. 158

With best compliments of

KHAS KAJORA COLLIERY EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Reg. No. 54 Date : 29.12.1983

P.O. Kajoragram, Dist. Paschim Bardhaman, PIN : 713338

Sl. No. 118

সুখের ঘরের সাজঘর, গ্যাংটক

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

'সু' মানে হল ভালো এবং 'খিম' মানে আবাস। অর্থাৎ তিব্বতীয় ভাষায় 'সুখিম' মানে 'সুখের আবাস' বা 'সুখের ঘর'। সুখিম শব্দটি সম্ভবত ব্রিটিশদের মুখে অবভ্রংশ হয়ে সিকিম হয়েছে। আবার স্থানীয় লোকশ্রুতি, নেপাল দেশের কোনো এক রাজকন্যের সুখের ঘর 'সু-হিম' থেকেই নাকি সিকিম হয়েছে। নেপালিদের কাছে সবুজ এই 'নতুন' অঞ্চল হল 'সিকিম'। তিব্বতীদের কাছে ধানের উপত্যকা 'ডেনজং' হচ্ছে সিকিম। কাঞ্চনজঙ্ঘার অক্ষরে অক্ষরে উচ্চারিত সিকিম আমার কাছে অন্তত মোটেও কিছু দূরনাগাল নয়। সিকিম এতটাই প্রিয়, দূরত্ব বুঝি না, আর এটাও মনে করি ঘরের বাইরে মানেই দূরত্ব নয়। যাত্রার পৃষ্ঠা সাজিয়ে সিকিমের সাথে অনেক ও অসংখ্যবার মূর্ত হয়ে উঠেছে আলাপন।

সিকিম সাম্রাজ্যের রাজধানী শহর গ্যাংটক। স্থানীয় ভাষায় 'গানতোক' মানে 'হাই হিল' বা উঁচু পাহাড়। পূর্ব সিকিমের ৯৫৪ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে ৫,৪০০ ফুট উঁচুতে ভুটিয়া ভাষায় 'দ্য টাউন অব দ্য হিলটপ' শহর গ্যাংটক। অতীতে অর্থাৎ ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যপাট ছিল ২১কিমি দূরের তুমলং-এ। পরে গ্যাংটকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে সমস্ত সিকিম রাজ্যের প্রতিভূ এই রাজধানী শহরে। এমনকি অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমানের জৌলুশ-এর এক আশ্চর্য মিশেল তথা ধারা বজায় রেখেছে এই শহর।

গ্যাংটকে এসে গান্ধি মার্গের ওপরই এক হোটেলে এসে উঠলাম। কাল সকালে সাইট সিয়িং যাবার ব্যবস্থা করা হবে। গান্ধি মার্গেই সিকিম ট্যুরিজমের অফিস। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা গেল সরকারি ব্যবস্থাপনায় আশপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখানোর ব্যবস্থা নেই। বরং প্রচুর বেসরকারি কন্ডাক্টেড ট্যুর প্রোগ্রাম রয়েছে যেগুলিতে চারপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে নেওয়া যায়। এখানে প্রতিটি মারুতি ভ্যানে মাত্র তিনজন করেই যাত্রী তোলা হয়। পেছনের আসনে দু-জন এবং সামনে ড্রাইভার ছাড়া একজন যাত্রী। এটাই নিয়ম। সাধারণত সকালে ও দুপুরে এই ট্রিপগুলি হয়। মোটামুটি তিনভাগে গ্যাংটকের দর্শনীয় স্থানগুলিকে ভাগ করে পর্যটকদের ঘোরানোর ব্যবস্থা আছে। থ্রি পয়েন্টসে থাকছে তাশি ভিউ পয়েন্ট, গণেশ টক, হনুমান টক; দ্বিতীয় সেভেন পয়েন্টসে থাকছে ওয়াটার গার্ডেন, হোয়াইট হল, দোদ্রুম চোর্তেন, রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজি, মারমসং গার্ডেন, হ্যান্ডলুম ক্রাফ্ট্স সেন্টার, এনচে মনস্ট্রি ও রুমটেক গুম্ফা। আবার হাতে সময় কম থাকলে একই সঙ্গে টেন পয়েন্টস ট্যুর প্রোগ্রামেও সবকটি দেখে নেওয়া যায়। তৃতীয় পর্যায় ছাঙ্গু লেক, নাথুলা পাস, বাবা মন্দির ইত্যাদি ঘোরা যায়। ট্যুর কো-অর্ডিনেটররাই সব ব্যবস্থা করে দেন।

হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে নামনাম অঞ্চলে সিকিম লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি-র সামনে থেকে রোপওয়েতে উঠে যাওয়া-আসা উপভোগ করেছি দুপুরে। সাত মিনিটে মাত্র ১ কিমি। লোয়ার টার্মিনাল স্টেশনে দেওরালি বাজার, মাঝের টার্মিনাল নাম-নাং এবং আপার টার্মিনালের নিচে তাশি লিং। প্রতিটি কেবলকার ২৪ জন বাহক নিতে পারে। নিচে গ্যাংটক শহরের গতিময়তার অপূর্ব দৃশ্য। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত চিনা প্যাগোডার অনুকরণে এনচে গুম্ফা। সিকিমের তান্ত্রিক গুরু উড়ন্ত লামা দ্রুপথপ কারপা এর

হনুমান টক

পূণ্যভূম বলে পরিচিত এটি। দেওয়ালে সুন্দর আঁকা ফ্রেস্কো। জানুয়ারিতে ২দিন 'ছাম উৎসব' তথা প্রসিদ্ধ 'মুখোশ নৃত্য' হয়। 'মৃগ উদ্যান'-এ সারনাথের মতো একটি বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। মূর্তির নিচে শিষ্য শান্তিদেবের উদ্ধৃত একটি শ্লোক স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে। এই পার্কটির অপর নাম হল রুস্তমজি পার্ক, যিনি একাধারে লেখক এবং চোগিয়াল-এর দেওয়ান ছিলেন। আছে চোগিয়াল-এর সুকলা-থাং অর্থাৎ প্রাসাদ। গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরি দারুন মুখোশ, কাঠের সম্ভার, 'চোক্সে' অর্থাৎ মুড়ে নেওয়া যায় এমন টেবিল, কম্বল ইত্যাদি।

তাশি ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রার্থনাচক্র 'মণি-লাথাং'। গুরু পদ্মসম্ভারার মূর্তিও রয়েছে। হনুমান টক-এর মন্দির থেকেও সমস্ত শহরটাকে বেশ দেখায়, উপরি পাওনা কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ। সাত কিমি দূরেই গণেশ টক। এখান থেকে সিনিয়ালচুর দৃশ্য এক্কেবারে নাগালেই। 'বুলবুলে' পার্ক বা হিমালয়ান জ্যুলজিক্যাল পার্ক আট কিমি দূরে। ২০৫ একর জমিতে ভাল্লুক, স্পটেড ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, রেড পান্ডা, কাঠবিড়ালিদের নিরাপদ আস্তানা। ফ্যামবং লোহ্ ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি থেকেও নানান পাখি এবং হিমালয়ান কালো ভাল্লুক, লাল পাণ্ডা, গোরাল, ক্লাউডেড লেপার্ড, সাইভেট ক্যাট ইত্যাদি দেখা যায়। নামগিয়াল ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দালাই লামা এবং দ্বার উদ্ঘাটন করেন জওহরলাল নেহরু। এটি বিশ্বখ্যাত বুদ্ধের দর্শন সংক্রান্ত বইয়ের আকরশালা। এখানে বৌদ্ধলামা ও বৌদ্ধদর্শন সংক্রান্ত পড়াশুনার জন্য শিক্ষার্থীরা দূর দূর থেকে আসেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচুর সংগ্রহ। রয়েছে পুথি। খানিক নিচের এক মন্দিরে গুরু রিমপোচে-এর মূর্তি এবং ৬০ ফুট উঁচু গুরু পদ্মসম্ভবার মূর্তি রয়েছে।

আরও আছে দো-দ্রুল-চোর্তেন, চোগিয়াল পালডেন থোনডুপ নামগিয়াল মেমোরিয়াল পার্ক। তিনিই নামগিয়াল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিকিম সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য তাঁর অবদান অপরিসীম। রুমটেক গুম্ফার পথে অর্কিডোরিয়াম-এ রয়েছে আড়াইশোর বেশি অর্কিড সাম্রাজ্য। তাদের ফুল ফোটার সময় হল এপ্রিল-মে, জুলাই-আগস্ট এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি। হোয়াইট হল নির্মিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। ব্রিটিশ গঠনশৈলীতে দ্বিতল বাড়ি। এখন এখানে অফিসার ক্লাব ও ব্যাডমিন্টন কোর্ট রয়েছে। এটি সিকিমের প্রথম রাজনৈতিক অফিসার ক্লাউড হোয়াইটের স্মৃতিতে নির্মিত। প্রজাপতি পার্ক ও সরমসা গার্ডেনও দ্রষ্টব্য তালিকায় অবশ্য রাখা ছিল।

দূরে রুমটেক গুম্ফা, নেহরু বোটানিক্যাল গার্ডেন, মার্তমখোলা ওয়াটার গার্ডেন, বাবা মন্দির, ছাঙ্গু লেক লিংদুম গুম্ফা, গান্ধি মার্গ

ভিউ পয়েন্ট, নালন্দা ইন্সটিটিউট অব বুদ্ধিস্ট স্টাডি, গনজাং গুম্ফা ইত্যাদি আরও ভুরি ভুরি দ্রষ্টব্যস্থল রয়েছে। অন্তত আড়াই দিন সকাল-বিকেল লেগে যাবে প্রতিটি পয়েন্ট ভালো মতো ঘুরে দেখতে। ভরসা গাড়ি। শহরের কাছাকাছি যেগুলো পায়ে হেঁটে দেখে নেওয়া যায়। আরও আছে ফ্যামভং লোহ্ ওয়াইল্ড লাইফ, বন ঝাঁকরি প্রপাত ও এনার্জি পার্ক, পল ঝুরমাং কাগ্যু মনাস্ট্রি, সা-নগর-চটমগ সেন্টার, কাথং গুম্ফা, কৈয়ংনম্‌লা অ্যালপাইন স্যাংচুয়ারি, সরমসা গার্ডেন, রুব্বার রফট, স্মৃতি বন, হুর হুরে ধারা ইত্যাদি। গ্যাংটক ও গ্যাংটকের কাছেপিঠে দ্রষ্টব্য পয়েন্টগুলির নাম লেখা যেন আর শেষ হতেই চায় না!

সন্ধেবেলা মহাত্মা গান্ধি মার্গ ধরে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে দোকানপাটগুলিতে ঘোরা যায়। পছন্দ করে একটা শীতপোশাকও কিনে ফেলা যায়। আর সিকিমের তৈরি নানান ছোটো ছোটো ঘরে পেরেকে ঝোলানোর মতো উপহার সামগ্রী 'থাংকাস' কেনা যায়। বুদ্ধ ও ড্রাগনের মোটিফ-যুক্ত শোকেসে সাজিয়ে রাখার কিছু জিনিসও পাওয়া যায় এখানকার লালবাজার থেকে। শপিং করতে করতে হুঁস থাকে না। খরচ হয়ে যায় লুকোনো পকেটমানির সিংহভাগ। ফিরতি পথে একটা নামি রেস্তোরাঁয় একদম অন্যরকম ধোঁয়া ওঠা এগ মোমো আর কর্ন স্যুপ খাওয়ার মজাই আলাদা।

মনকাড়া সাঁঝবিকেল আর স্বপ্নে দেখা ভোর নিয়ে গ্যাংটকে কেটে যায় দুদিন। গ্যাংটকে যতবার আসা যায়, লেজুড় হয়ে থাকে ককনও উত্তর সিকিমের রেশমপথ তো কখনও এপারের দার্জিলিং-কালিম্পং। কখনও গ্যাংটক থেকে পেলিং প্রত্যাবর্তন। ফুরিয়ে আসে সময়। খরচ হয়ে যায় আশ্চর্য ধারাবাহিকতা।

যাওয়া-আসা : ধর্মতলা থেকে শিলিগুড়ির প্রচুর বাস ছাড়াও ট্রেনে যাওয়া যায় হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে। নামতে হবে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে। সব থেকে ভালো ট্রেন রাত ১০টা ৫মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ছাড়ে দার্জিলিং মেল এবং পরের দিন সকাল ৮টা ৪০ নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছায়। এছাড়া শিয়ালদহ থেকে তিস্তা-তোর্সা, কাঞ্চনকন্যা, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস যায়। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন অথবা শিলিগুড়ির তেংজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ড থেকে মাথাপিছু ভাড়ায় সুমো অথবা ম্যাক্সএল গাড়িতে কিংবা এস এনটি-র বাসে গ্যাংটক যাওয়া যায়।

থাকা : গ্যাংটক, পেলিং ইত্যাদি জায়গায় প্রচুর হোটেল রয়েছে। গ্যাংটকে গান্ধিমার্গ অথবা দেওরালিতে থাকা সুবিধাজনক।

সময় : সব থেকে ভালো সময় ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর। এই সময় অবশ্য ভারি গরম পোশাক প্রয়োজন।

ভিন্ন স্বাদ

সুকৃতি ঘোষাল

অমিত সাহা উদীয়মান নয়, প্রতিষ্ঠিত কবি। নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতায় নাম-ডাক পেতে ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছে থাকতে হয়। রবীন্দ্র-গন্ধমাখা বোলপুরে তাঁর বাস—শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া নিজের ঢাকঢোল বাজাতে পছন্দ করেন না, অন্তরালেই তিনি স্বচ্ছন্দ। তাই কতজন তাঁকে নামে চেনেন তা বলা শক্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের বাংলা কবিতার খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁরা অমিত সাহার গুণগ্রাহী। পেশায় অধ্যাপক অমিতের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'ক্লোরোফিলের কান্না' (চয়নিকা, ২০১৭) হাতে পেয়ে মন ভরে গেল। হালকা-গাঢ় হলদে সবুজ রঙে আঁকা তৌসিফ হকের প্রচ্ছদটি নয়নাভিরাম। পাতা উল্টেই চমক—কাব্যগ্রন্থটি 'সাদা পাতার অপচয় করেন না যারা' তাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। বৃক্ষনিধন ব্যতীত যেহেতু কাগজ উৎপাদন সম্ভব নয়, প্রতিটি 'সাদা পাতা'-র ভিতর লুকিয়ে আছে ক্লোরোফিলের কান্না। সেই পাতা অপচয় করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু এ কি নিছকই পরিবেশ ভাবনা? কবি যিনি সাদা পাতা দেখলেই সৃষ্টিসুখের উল্লাসে সেখানে মেতে উঠতে চান, তিনি বোঝেন পাতার কদর। হয়তো তাই এ কাব্য সমস্ত স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

মাত্র ৫৭টি কবিতা নিয়ে এ বই, ক্ষুদ্রতম কবিতাটি দু-পংক্তির (ব্রাত্য সত্য, ৩৪)। কোনো কবিতাই এক পাতা ছাড়ায়নি। কিন্তু কবিতাগুলো পড়তে গেলে কেমন যেন ঘোর ধরে যায়। 'শোষণ আর শ্বসনের তফাৎ একমাত্র ক্লোরোফিলই জানে' (৯) কথাটা প্রতীকী মাত্রা পায় যখন দেখি কবিতায় আত্মমগ্নতা ও বহির্মুখী পর্যবেক্ষণ অনায়াসে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। তীব্র অনুভূতিপ্রবণ কবিমন। ডিসেকশন টেবিলে ক্লোরোফর্ম মাখা পেট-কাটা ব্যাঙ, যার কাছে গোটা বিশ্ব হয়ে ওঠে আইসিইউ (৪৮), যেমন তাঁর মন নাড়া দেয়, তেমনি নাড়া দেয় মিলনমেলায় দেখা সদ্য মাতৃহারা চড়ুইশাবকটি, যে 'শীতের সকালে ডানা শুকোচ্ছিল। উচিত ছিল তাকে একমুঠো একস্ট্রা রোদ্দুর দেওয়া'; তেমনি নাড়া দেয় 'শহুরে গলিতে কন্ডোম হাতে দাঁড়িয়ে থাকে যে উন্মনা যৌনকর্মী' (৫৫)।

কাব্যগ্রন্থটির মূল সুর কী? তা যদি হয় প্রেম, তার চরিত্র কী? কবির কখনো মনে হয় বৃষ্টি প্রেম নয়, কামকেই উসকে দেয় (১৯)। কখনো তিনি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে উচ্চারণ করেন 'যৌনতা নয়—মৌনতা দিয়েই মেপেছি তোমায়' (২০)। চুম্বন কবির অবসেশন। কিন্তু সব চুম্বনই 'যূতসিদ্ধ ঠোঁটের চুম্বন উপাসনা' (১৭) নয়। কখনো তা 'দুই মলাটের ঠোঁট' (১৫), কখনো তা 'অধরসঙ্গমে মত্ত সিগারেট', কখনো তা ঘাসের ঠোঁট চোষা ফড়িং (৩৩)। কিছু ক্ষেত্রে চুম্বনক্রিয়ার লক্ষণাধর্মী প্রয়োগ অস্বস্তিকর ঠেকে, যেমন 'কোদালের ঠোঁটে মাটির চুমু খাওয়া' (৫২)। স্বধর্ম বজায় রেখে অহি-নকুল পরস্পরের কাছে এলে তাকে 'চুম্বন' বা 'সঙ্গম' দিয়ে একমাত্র ব্যাঙ্গার্থেই প্রয়োগ করা যায়, অন্যত্র নয়। সে যাই হোক, কবিতাগুলি নিছক আত্মমগ্ন সংলাপ নয়। সমাজ ও পারিপার্শ্ব বিষয়ে কবি উদাসীন নন। তাঁর সমাজবীক্ষা স্পষ্ট, যদিও সম্মুখপ্রোথিত নয়; হয়তো বা সচেতনভাবেই কিছুটা অবগুণ্ঠিত। কবির সমাজচেতনা বহুস্তরীয়। কোথাও তিনি চাহিদা-যোগানের নিয়মের অভিঘাত নিয়ে উৎকণ্ঠিত ('ফলন বাড়লে চাষি মরে/কমলে মরে মধ্যবিত্ত', ১৪); কোথাও তিন লক্ষ করেন যে 'ফসলের মালিকানা পেতে রক্ত ঝরে' (৬৪)। হোয়াটস্‌অ্যাপে ধর্ষণ ভিডিও ও ভাষা দেখে (১০) বা ধর্ষিতা তাপসী 'বৃদ্ধার বুকে আঁচল তুলে' দেবার কেউ নেই (১৬) দেখে কবি যেমন বিচলিত, তেমনি সমান বিচলিত একাদশীতে উপোসী বিধবার কষ্টে ('কাঁসার থালায় চকচক করে খিদে', ৫৩)। ঘিঞ্জি শহরে নির্জনতার অভাবে প্রেমকথার দুরবস্থা (তার স্থান শেষ পর্যন্ত সিলেবাসে, ৫৪) তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না; তিনি নজর করতে ভোলেন না কীটনাশকের প্রয়োগে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ ('মধুমাখা ক্লোরোফিল তেতো হয় শৈল্পিক বিষে', ৩৩)। বস্তুত, কবির পরিবেশচেতনা কবিতাগুলিকে অন্য এক মাত্রা দেয়। যখন কোনো কেতাবি বুলি না আউড়ে 'নদীরা শীর্ণ হতে হতে চাষযোগ্য মাঠে পরিণত হয়' (৬৪)

বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তখন বোঝা যায় অনুভূতির কোন সুগভীর তল থেকে উৎসারিত এ উচ্চারণ।

অনুভূতির সূক্ষ্মতা, সমাজচেতনার স্বচ্ছতা নিঃসন্দেহে অমিতের কাব্যের বিশেষ সম্পদ। তবে ভাষার যে গুণের জন্য অমিত অন্যদের থেকে আলাদা তা হল অভাবিতপূর্ব বাক্‌প্রতিমা নির্মাণের দক্ষতা এবং ধাক্কা দেওয়ার মতো শব্দপ্রয়োগের দুঃসাহস। কামোত্তেজনার বর্ণনায় কবি যখন লেখেন 'রক্তেরা মাংসপেশির সাথে মেতেছে সংঘর্ষে' (১৩) অথবা প্রেমিকার দেহের 'গরম ভাতের বাষ্পের' উষ্ণতায় প্রেমিকা যখন সেঁকতে চায় তার 'আন্টার্কটিকার শরীর' তখন তার চমৎকারিত্বে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। অমিতের চিত্রকল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য হল যে সেগুলো নতুন হলেও অপরিচিত নয়, অর্থাৎ সেগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পাঠকের কষ্ট হয় না। ধরা যাক 'গ্রহণকালে' কবিতার মৃত রমণীর বর্ণনা, যে সুজাতা হয়ে পায়েসবাটি নিয়ে কারুর অনাহারভঙ্গ করেনি, 'উলটে মাছিদের মিছিলে মুখ ঢেকেছে, সাদা থানে জড়িয়ে ফেলেছ সারা শরীর'। এই যে মুখে মাছি বসা বাক্‌প্রতিমা দিয়ে প্রাণহীন দেহের আভাস, এ বড় সাধারণ নয়। আর ভাষা—যেন শাণিত তরবারি, যার প্রধান কাজ চমকে দিয়ে আমাদের সম্বিৎ ফেরানো : যেমন, 'বাচনিক বসন্তবাজি' (১১), 'চাঁদেলা অভিমান' (১০), 'বিরহ কথকতা' (৪৫)। ছকে বাঁধা শব্দবন্ধকে ভেঙে নবনির্মাণের একটা সচেতন প্রয়াস অমিতের লেখায় সহজেই ধরা যায়। আর যেটা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন তা হল বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের অবিকৃত অননূদিত প্রয়োগ। যেমন, 'বসন্ত মেতেছে বাই ডিফল্ট প্রেমে' (১০), 'তোমার ফ্লিপকার্ট-ব্যস্ততায় মেতে আঙুলের ডগা/দিচ্ছে না কিছুতেই ক্যাশ-অন-ডেলিভারি' (৫৫)। এসব কথা আমরা চলতি বাংলায় হামেশাই বলি। কিন্তু কাব্যধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে কবিতায় যে এগুলো প্রয়োগ করা যায়, অমিতের কবিতা না পড়লে বোঝা যেত না।

'আর পাঁচটা মানুষের যেমন খিদে পায়, প্রেম পায়, অমিতের তেমনি 'রাত বারোটার পর কবিতা পায়' (২৪)। অমিতের কাব্যে তাই কাব্যরচনার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। কোনো কবিতায় কথক প্রেমিকার হাসিকে 'মোনালিসা দিয়ে' মাপতে না চেয়ে 'সাদা খাতায় নীল কালির আঁচড়ে' তার 'অভিমানের মৌনতা সাবটেক্সটটিকে' ধরে রাখতে চায় (১১)। কোথায় শ্যাওড়াগাছ আর আমগাছের ঝগড়া থামাতে 'রত্নগর্ভা সাদা পাতাগুলো দোয়াত থেকে কলমকে ডাকে' (৫০)। কোথাও প্রেমিকাকে নিয়ে স্বপ্ন-সফরের মধ্যে রক্তবহনের ছন্দপতন ঘটলে প্রেমিকা আটকে যায় 'দুই মলাটের ঠোঁটে' (১৫)। স্বপ্নে হয়তো ছেদ পড়ে কিন্তু তা পূর্ণতাও পায় যখন তা কবিতার মণিমাণিক্য হয়ে ফুটে ওঠে। কবি সংস্কৃতের অধ্যাপক, তাই তৎসম শব্দের প্রতি তাঁর একটু সৌধীন্দ্রিক দুর্বলতা আছে—যেমন, 'যূথসিদ্ধ' (১৭), 'ঊর্মির প্রাচেতস' (৩৯), 'সার্ষপ ভূত' (৫১)। এটুকু বাদ দিলে ভাষার তেজ ঈর্ষণীয়। তিন চারটি মুদ্রণপ্রমাদ—ভর্তির বদলে 'ভতি' (১২), 'ঠায়'-এর বদলে 'ঠাঁয়' (৩২), 'ব্যঞ্জনা'-র বদলে 'ব্যাঞ্জনা' (৫৫)' মধ্যবিত্ত'-র বদলে 'মধ্যবৃত্ত'—বাদ দিলে, ছাপা সযত্ন ও সুশোভন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি ছাড়াও 'বিরহকথকতা' (হাওয়াকল), 'বৃষ্টি ভাঙে যখন' (সিগনেট প্রেস) ও 'পাতাঝরা এবং' (ভবিষ্যৎ) শীর্ষক তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন কবি। তাঁর 'সুনির্বাচিত কবিতা'-র প্রত্যাশায় থাকবে পাঠক।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সারা জীবনের সঞ্চয় ডাক্তারের কাছে না দিয়ে

মেডিক্লেম করান

নিশ্চিন্তে থাকুন

Star Health And Allied Insurance Co. Ltd.

For Mediclaim Please Contact

Debkumar Das

M : 9732392222

Interested person may contact for Agency

Sl. No. 127

With best compliments of

Shyamsundarpur Colliery Employees' Co-operative Credit Society

Shyamsundarpur, P.O. Ukhra,
Paschim Bardhaman

Sl. No. 136